لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২২শ সংখ্যা
৮ই যিলহজ্জ, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে মে, ১৯৯৩ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ২২তম সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ হজ্জ ও কুরবানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৫

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৭

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ১১

ঈদুল আযহার খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুস মসীহ সালেস (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ১৫

ওড়িশার ডাক
আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ১৯

ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)
মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী ২৫

ইসলামে সামাজিক জীবন
জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী ৩৭

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ৩৯

ছোটদের পাতা
পরিচালক—জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪২

একটি প্রতিবেদন
অনুবাদ ঃ জনাব মকবুল আহমদ খান, সম্পাদক ৪৪

সংবাদ ৪৮

মসীহ মাওউদের (আঃ) একটি ভবিষ্যদ্বাণী
ঋতু পত্রের সৌজন্যে ৫৪

সম্পাদকীয় ঃ

খেলাফত দিবস

২৭শে মে খেলাফত দিবস। যে সব জামাত এ দিবস পালন করেছেন তাদেরকে সত্বর রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২২তম সংখ্যা

৩১শে মে, ১৯৯৩ : ৩১শে হিজরত, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা—আস্ সাফ্‌ফাত—৩৭

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে]

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব, দেখ আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!
৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহা উদ্বেগ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।
৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি রাখিয়াছিলাম।
৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।
৮০। সকল জগদ্বাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!
৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সৎকর্মশীল লোকদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।
৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মোমেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।
৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্‌রাহীমও ছিল;
৮৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রভুর সমীপে বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল;
৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কাহার ইবাদত কর?'
৮৭। কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মিথ্যারূপে অন্য মা'বূদগণকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছ?
৮৮। যাহাহউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা?
৮৯। অতঃপর, সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিল,
৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসুস্থতাবোধ করিতেছি।'
৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।
৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মাবূদগুলির দিকে অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু খাইতেছ না কেন?

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও বলিতেছ না ?'

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।

৯৫। ফলে তাহারা (লোকেরা) তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর'

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ?'

৯৮। তাহারা সকলেই বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।

১০০। সে বলিল, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করিবেন।'

১০১। (সে বলিল) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল পুত্র দাও।'

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০৩। অতঃপর, যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে যবাই * করিতেছি, সুতরাং তুমি চিন্তা কর তোমার কি অভিমত ?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইনশাল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

---

* টিকা: আল্লাহ্তা'লার আদেশক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাহাকে কুরবানী রূপে পেশ করিয়াছিলেন হযরত ইসমাঈলকে না হযরত ইসহাক্কে, এই নিয়া কুরআন ও বাইবেলে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন হযরত ইসহাক (আদি পুস্তক-২২:২)। আর কুরআন দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে, কুরবানীর পাত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। এই ব্যাপারে বাইবেলেও পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে 'আব্রাহামকে' আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করিতে, কিন্তু ইসহাক (আঃ) কোন কালেই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-এর চাইতে ১৩ বৎসরের বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র সন্তান হিসাবে তিনি পিতার কাছে অত্যধিক আদরের

ছিলেন। অতএব ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের কেহ কেহ অনর্থক বলিয়া থাকেন যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) দাসীর পুত্র হওয়াতে তাহার মাঝে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল। কিন্তু হযরত ইসহাক (আঃ) স্বাধীন রমনীর সন্তান হওয়াতে, তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (গালাতীয়-৪ঃ২২—২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাজেরা দাসী ছিলেন বরং তিনি মিশরের রাজ পরিবারের কন্যা ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখিতে পাই হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে বারংবার ইব্‌রাহীমের পুত্র বলা হইয়াছে যেইরূপে ইসহাককে বলা হইয়াছে (আদি পুস্তক-১৬ঃ১৬; ১৭ঃ২৩, ২৫)। তাহাছাড়া একই ধরনের 'বিরাট ভবিষ্যতের" প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আঃ) উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক—১৬ঃ১০, ১১; ১৭ঃ২০)।

বাইবেলে 'মারওয়া' পাহাড়কে মেরিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইসমাঈল (আঃ)-এর নামের স্থলে ইসহাক্‌ (আঃ) বসানো হইয়াছে। মারওয়া মক্কার অদূরে একটি পাহাড় যেখানে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সহ হাজেরাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 'মারওয়ার' স্থলে মেরিয়া আর ইসমাঈলের স্থলে ইসহাক্‌ এই দুই শব্দ বদল ব্যতীত সমর্থনের নিমিত্ত আর কোন কিছু নাই, যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ইসহাক্‌ই (আঃ) ছিলেন কুরবানীকৃত পুত্র; ইসমাঈল (আঃ) নহেন। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল, হযরত ইসহাককেই কুরবানী দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইহুদী ও খৃষ্টানগণ মনে করিলেও তাহাদের কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এত বড় একটা ঘটনার কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারা যাহা বলে তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে তাহারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্মৃত হইত না; কোনও না কোন ভাবে তাহাদের ধর্মাচারে ইহা জাগরূক থাকিত। অপরদিকে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে, ইসমাঈলের ঐ কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করিয়া যিলহজ্জ মাসের দশম দিনে সারা বিশ্বে তুলামূল সাড়া জাগাইয়া তোলে। মুসলমান কর্তৃক দুম্বা, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এই সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের উর্ধ্বে এবং প্রমাণ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম কুরবানীর জন্য ইসহাককে নয় বরং ইসমাঈলকেই পেশ করিয়াছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাঁহার স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করিতে হয় নাই, যদিও তিনি ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আক্ষরিকভাবে উহা পালন করিতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধূঁ ধূঁ উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়েই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে যবাই করার জন্য কপালের উপর উপুর করিয়া শোয়াইল ঃ

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইব্‌রাহীম!

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপে সৎকর্মশীল-দিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদিয়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম। *

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম। **

১১০। ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মোমেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইস্‌হাকের সুসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১৪। এবং আমরা তাহার * * * উপর এবং ইস্‌হাকের উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

এই যে বীরত্বের কার্য, ইহারই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রহিয়াছে। প্রথমে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম! হুকুম পালন করা হইয়া গিয়াছে—এই দুই নির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এখন হইতে মানুষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হইল। কেননা, এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল।

* ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আয়াতটিতে আরও বুঝা যায় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেওয়ার যে প্রচলন ছিল, তাহা পশু কুরবানীতে বদলাইয়া দেওয়া হইল।

** ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যের জন্য আর কি হইতে পারে যে, তিন তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁহাকে আপন পিতৃপুরুষ মানিয়া গৌরববোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হইল ইসলাম, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম।

*** 'এবং আমরা তাহার উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম' দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশকে ইসলামের মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত করার কথা বলা হইয়াছে। কেননা ইস্‌হাকের নাম ও তাঁহার আশিসপ্রাপ্তি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদিস শরীফ

হজ্জ ও কুরবানী

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন :

و على الناس حج البيت من استطع اليه سبيل (ال عمران ركوع نمبر ١٠)

তরজমা : যারা কা'বা গৃহের হজ্জ করার যোগ্যতা রাখে তাদের জন্য (হজ্জ) বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১০ রুকু)

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالة التقوى منكم (الحج ايت نمبر ٣٨)

তরজমা :- উহার (তোমাদের কুরবানীর) গোশ্‌ত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পেঁাছায় না বরং তোমাদের তাক্‌ওয়া তাঁর নিকট পেঁাছায়। (সূরা আল্‌ হজ্জ : ৩৮ আয়াত)

হাদীস :

عن ابى هريرة قال خطبنا رسول الله صلعم فقال يايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ـ فقال رسول الله صلعم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيئى فاتوا ما استطعتم واذا نهيتكم ان شيئى فدعوة (مسلم)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন একবার এক খুতবায় হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেন, "হে লোকগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে এই জন্য তোমরা হজ্জ কর।" (এই কথা শুনার পর) এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! প্রত্যেক বৎসরই কি হজ্জ আবশ্যক।" তিনি চুপ থাকেন। তিনবার এই প্রশ্ন করা হলো। অতঃপর, তিনি বল্লেন, "যদি আমি হঁা বলে দিতাম তা হলে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে যেত যার তোমরা শক্তি রাখতে না।" তিনি আরও বল্লেন, "যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে কিছু না বলি তোমরা আমাকে ছেড়ে দিও। অযথা তোমরা প্রশ্ন করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণকে বেশী বেশী প্রশ্ন করত।

তারপর তারা যে কথা বলতেন তারা তার বিপরীত কাজ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যখন আমি তোমাদিগকে কোন হুকুম দেই তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা কর, আর যা থেকে তোমাদিগকে বারণ করি তোমরা তা থেকে বিরত থেকো।"

ব্যাখ্যা : হজ্জ একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান। কুরআনের শিক্ষানুসারে মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম উপসনালয় বা ইবাদত গৃহ হলো কা'বা। হযরত আদম (আঃ) ইহাকে নির্মাণ করেছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই কা'বাকে পুনঃ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) দ্বারা ইহা আবার ইহার পূর্ণ সৌন্দর্য ও মর্যাদা ফিরে পায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী যা তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে যবাই করে দিতে চেয়ে ছিলেন, আল্লাহ্‌ তাঁর সেই কুরবানীকে কবুল করে হজ্জ আকারে কিয়ামত পর্যন্ত চির স্মরণীয় করে দিলেন। হজ্জের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার সম্পর্ককে ছিন্ন ও চূর্ণ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে সার্থক করে তোলার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পার্থিব সব কিছু পরিত্যাগ করে মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয় এবং এইভাবে জন্মভূমি, প্রিয়-পরিজন ও সহায় সম্পদকে কুরবানী করার শিক্ষা গ্রহণ করে। সমস্ত পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করাই হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কুরআন ও হাদীসে ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পশু কুরবানী করার নির্দেশ আছে। পশু কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীগণ এবং মুসলমানগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ-এর কুরবানীর কথা তাঁহাদের নযীরবিহীন ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কথা। রূপকভাবে এর মধ্যে এই শিক্ষা নিহিত আছে যে, মানুষ যেন শুধু নিজেকে কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত না রাখে, উপরন্তু তাকে তার ধনসম্পদ এমন কি সন্তান সন্ততিকেও আল্লাহ্‌র পথে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হজ্জের গুরুত্ব উপলক্ষ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত সতর্কবাণী স্মরণ করা যেতে পারে।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায় না করে তাহলে সে ইহুদী কি খৃষ্টান হয়ে মৃত্যু বরণ করে সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নাই।"

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর
অমৃতবাণী

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২০তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

কেহ কেহ এই কারণে বয়াত করেন যে, তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি বলেন, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে এবং এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালাম—অনুবাদক) খোদার শেষ খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে কোন কোন ব্যক্তি আমার জন্মের বা আমার সাবালক হওয়ার পূর্বেই আমার নাম লইয়া আমার মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন। যেমন নেয়ামতউল্লাহ ওলী ও লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামের মিয়া গোলাব শাহ্। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ, যাহার পরিধি প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে আর ইহা হইল মোবাহালার সিলসিলা (প্রার্থনা-যুদ্ধ-রীতি—অনুবাদক)। ইহার অনেক নমুনা জগদ্বাসী দেখিয়া লইয়াছে। * আমি অনেক দেখার পর মোবাহালার রীতি নিজের পক্ষ হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং যে ব্যক্তি আমাকে প্রতারক ও খোদাতা'লার নামে মিথ্যা রটনাকারী মনে করে এবং আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার প্রতি যে সকল ওহী হইয়াছে ঐগুলিকে আমার মিথ্যা রটনা মনে করে, সে মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক বা আর্যসমাজী হউক বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হউক, তাহার অবশ্যই এই অধিকার আছে যে, সে নিজের পক্ষ হইতে আমাকে মোকাবেলায় রাখিয়া লিখিত মোবাহালা প্রকাশ করুক। অর্থাৎ খোদাতা'লার সম্মুখে এই অঙ্গীকার কতিপয় খবরের কাগজে প্রকাশ করুক যে, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি আছে এই ব্যক্তি (এই জায়গায় ব্যাখ্যাসহ আমার নাম লিখিতে হইবে) যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করে, সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং এই সকল

---

* প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীর পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন কিভাবে সে নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবহালা করে। সে নিজ পুস্তক "ফয়যে রহমানী" তে ইহা প্রকাশ করে। অতঃপর এই মোবাহালার কয়েক দিন পর সে মৃত্যু বরণ করিল। জম্মুর অধিবাসী চেরাগদীন নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করে এবং লেখে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাহাকে খোদা ধ্বংস করিবেন। ইহার কয়েকদিন পর সে নিজের দুই ছেলেসহ ধ্বংস হইয়া গেল।

ইলহাম, যাহার কোন কোনটি সে এই পুস্তকে লিখিয়াছে, এইগুলি খোদার কথা নহে, বরং সবগুলিই তাহার বানানো কথা এবং আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও পূর্ণ চিন্তাভাবনার পর এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহাকে আমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যারটনাকারী, মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল মনে করি। অতএব, হে পরাক্রমশালী খোদা! যদি তোমার নিকট এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং মিথ্যাবাদী, মিথ্যারটনাকারী, কাফের ও বিধর্মী না হয় তবে এই মিথ্যা-রোপ ও অবমাননার জন্য আমার উপর কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর; অন্যথা তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ কর। আমীন।

প্রত্যেকের জন্য কোন তাজা নিদর্শন চাওয়ার এই দরজা খোলা আছে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই মোবাহালার দোয়ার পর, যাহা সাধারণভাবে প্রচার করিতে হইবে এবং কমপক্ষে তিনটি নামকরা খবরের কাগজে ছাপাইতে হইবে, যদি এইরূপ ব্যক্তি যে এই ব্যাখ্যাসহ কসম খাইয়া মোবাহালা করে এবং ঐশী শাস্তি হইতে রক্ষা পায়, তবে আমি খোদার পক্ষ হইতে নহি। এই মোবাহালায় কোন মেয়াদকালের প্রয়োজন নাই। শর্ত এই যে, এইরূপ কিছু অবতীর্ণ হইবে যাহা হৃদয় অনুভব করিবে।

এখন নিম্নে অনুবাদসহ কিছু খোদায়ী ইলহাম লিখিতে যাইতেছি। এই ইলহামগুলি লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ মোবাহালাকারীগণের জন্য ইহা জরুরী হইবে যে, তাহারা খোদাতা'লার কসম খাইয়া আমার এই সকল ইলহামকে নিজেদের মোবাহালার প্রবন্ধে (যাহা প্রকাশ করিতে হইবে) লিখিবে এবং ইহার সাথেই অঙ্গীকারও প্রকাশ করিবে যে, এই সকল ইলহাম মানুষের মিথ্যা বানানো জিনিষ, এইগুলি খোদার কথা নহে। ইহাও লিখিতে হইবে যে, এই সকল ইলহাম আমি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইয়াছি। আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, এইগুলি মানুষের বানানো জিনিষ। অর্থাৎ এই ব্যক্তির মিথ্যা বানানো জিনিষ এবং এই ব্যক্তির উপর খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন ইলহাম অবতীর্ণ হয় নাই। বিশেষভাবে এস্থলে আমি পাতিয়ালায় সহকারী সার্জন আবদুল হাকিম খান নামের এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতেছি। এই ব্যক্তি বয়াত ভাঙ্গিয়া ধর্ম ত্যাগী হইয়া গিয়াছে।

এখন আমি ঐ সকল ইলহাম * নমুনাস্বরূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঐগুলি নিম্নরূপ :—

---

* বারবার পুনরাবৃত্তির দরুন এই সকল ইলহামের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন। কেননা ইলাহী ওহীর এই বাক্যসমূহ কখনো এক ধারাবাহিকতায় এবং কখনো অন্য ধারাবাহিকতায় আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। তদুপরি কোন কোন বাক্য সম্ভবতঃ শত শত বার বা ইহার চাইতেও অধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছে। এই জন্য ইহাদের পঠন এক ধারাবাহিকতায় নাই এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইবে না। কেননা খোদার রীতি এইরূপই যে, তাঁহার পবিত্র ওহী খণ্ড খণ্ড হইয়া মুখে জারী হয় এবং হৃদয়ে আবেগের সৃষ্টি হয়। অতঃপর খোদাতা'লা নিজেই এই সকল বিভিন্ন খণ্ডকে ধারাবাহিকতার রূপ দান করেন এবং কখনো কখনো ধারাবাহিকতার সময় প্রথম খণ্ডকে রচনার পিছনে লাগাইয়া দেন। ঐ সকল বাক্যকে কোন একই বিশেষ ধারাবাহিকতায় রাখা হয় না। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ রীতি। বরং ধারাবাহিকতার দিক হইতে ইহাদের পঠন বিভিন্নভাবে হইয়া থাকে। পুনরাবৃত্ত ওহীর কোন কোন বাক্যের পূর্বের শব্দসমূহের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। এই রীতি কেবলমাত্র খোদাতা'লার নিজস্ব। তিনি স্বীয় রহস্য উত্তম জানেন।

বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম

(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ইলহামসমূহ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। হাকিকাতুল ওহী পুস্তকে ইলহামসমূহ আরবীতেই লেখা আছে, কিন্তু আরবী ইলহামের সাথে সাথে উহাদের উর্দু তরজমাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা মূল আরবী ইলহাম বাদ দিয়া কেবলমাত্র উর্দু ভাষায় তরজমাকৃত ইলহামসমূহের বঙ্গানুবাদ পেশ করিতেছি। কোন দিন এই পুস্তকটির পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, ইনশাল্লাহ্, আরবী ইলহামসমূহও সংযোজন করা হইবে। —অনুবাদক)

"হে আহমদ, খোদা তোমার মধ্যে বরকত রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা কিছু তুমি চালাইয়াছ তাহা তুমি চালাও নাই, বরং খোদা চালাইয়াছেন। খোদা তোমাকে কোরআন শিখাইয়াছেন। অর্থাৎ ইহার সঠিক অর্থ তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে তুমি ঐ সকল লোককে সতর্ক করিবে যাহাদের বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদেরকে ধরার রাস্তা খুলিয়া যায়, অর্থাৎ জানা যায় কে তোমার প্রতি বিমুখ হয়। বল, আমি খোদার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী। বল, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিতেই। প্রত্যেক বরকত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে। অতএব বড় ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে শিক্ষা দিয়াছে এবং যে শিক্ষা পাইয়াছে। বলিবে যে, ইহা ওহী নহে। কথাগুলি নিজের তরফ হইতে বানাইয়াছে। তাহাদিগকে বল, তিনি খোদা, যিনি এই কথাগুলি অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে হাসি তামাসার ধারণায় ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে বল, যদি এই কথাগুলি আমার বানানো হয় এবং খোদার কথা নয় তবে আমি কঠোর শাস্তির যোগ্য হইব। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? তিনিই তাঁহার রসূল ও প্রত্যাদিষ্টকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন। খোদার কথা পূর্ণ হইয়াই থাকে। কেহই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে না। লোকেরা বলিবে, এই মর্যাদা তুমি কোথা হইতে পাইয়াছ? এই যে এলহামের মাধ্যমে বলা হইতেছে ইহাতো মানুষের কথা এবং ইহা অন্যদের সাহায্যে বানানো হইয়াছে। হে লোকেরা! তোমরা জানিয়া শুনিয়া একটি প্রতারণার মধ্যে জড়াইতেছ? এই ব্যক্তি তোমাদিগকে যে সকল ওয়াদা দিতেছে এইগুলি পূর্ণ হওয়া কিভাবে সম্ভব ও তদুপরি এই রূপ ব্যক্তির ওয়াদার কি মূল্য আছে, যে হীন ও নিকৃষ্ট? এই ব্যক্তি তো মূর্খ ও উন্মাদ, যে আবোল তাবোল কথা বলে। ইহাদিগকে বল, আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা কি গ্রহণ করিবে, না কী গ্রহণ করিবে না? অতঃপর ইহাদিগকে বল, আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা কি ঈমান আনিবে, না কী আনিবে না? আমি ইহার পূর্বে এক দীর্ঘ সময় তোমাদের সাথেই কাটাইতে ছিলাম। তোমরা কি বুঝিতেছ না? এই মর্যাদা তোমার প্রভুর দয়ায় লাভ করিয়াছি। তিনি স্বীয় পুরস্কার তোমার উপর পূর্ণ করিবেন। অতএব তুমি সুসংবাদ দাও। খোদার ফযলে তুমি উন্মাদ নহ। আকাশে তোমার জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা ও মাকাম রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের দৃষ্টিতেও তোমার উচ্চ মর্যাদা ও মাকাম রহিয়াছে, যাহারা দেখিতে পায়। তোমার জন্য আমি নিদর্শন দেখাইব। যাহারা অট্টালিকা নির্মাণ করে আমরা তাহা চুরমার করিয়া দিব।

ঐ খোদার প্রশংসা যিনি তোমাকে মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম বানাইয়াছেন। তিনি যে সকল কাজ করেন সে সকল কাজের জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হন না এবং লোকদিগকে তাহাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। * তাহারা বলিল, তুমি কি এইরূপ ব্যক্তিকে খলীফা বানাইতেছ, যে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে? তিনি বলিলেন, তাহার সম্পর্কে আমি যাহা কিছু জানি তোমরা তাহা জাননা। আমি ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করিব, যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা পোষণ করিবে। আমার নৈকট্যে থাকিয়া আমার রসূল কোন দুশমনকে ভয় করে না। খোদা লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমি ও আমার রসূল জয়যুক্ত হইয়া যাইবে। **

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) ক্রমশঃ

---

* খোদাতা'লার পবিত্র কথা, যাহা আমার কেতাব 'বারাহীনে আহমদীয়া' এর কোন কোন জায়গায় লেখা হইয়াছে। ইহাতে খোদাতা'লা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কিভাবে তিনি আমাকে ঈসা ইবনে মরীয়ম সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই কিতাবে প্রথমে আমার নাম মরীয়ম রাখেন এবং ইহার পর প্রকাশ করেন যে, এই মরীয়মের মধ্যে খোদার তরফ হইতে রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপ আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, রূহ্ ফুঁকার পর মরীয়মি অবস্থা ঈসায়ী অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইভাবে মরীয়ম হইতে ঈসার জন্ম হইয়া ইবনে মরীয়ম বলিয়া কথিত হইল। অতঃপর অন্য জায়গায় এই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا۔

(সূরা মরীয়মের ২৪ নং আয়াত: অর্থ—"অতঃপর যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, ইহার পূর্বে যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম"—অনুবাদক)। এই জায়গায় খোদাতা'লা রূপকের ভাষায় বলেন, যখন এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মরীয়মি অবস্থা হইতে ঈসায়ী অবস্থার জন্ম হইল এবং এই প্রেক্ষাপটে এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ইব্‌নে মরীয়মে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিল তখন তবলীগের প্রয়োজনে, যাহা প্রসব বেদনার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। তাহাকে উম্মতের শুষ্ক শিকড়ের সম্মুখে আনা হইল যাহাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) ফল ছিল না। এইরূপ দাবীর কথা শুনিয়া মিথ্যা বানাইয়া বলার অপবাদ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল। তখন সে নিজের মনে মনে বলিল, হায়! আমি যদি ইহার পূর্বেই মরিয়া যাইতাম এবং এইরূপ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম যে কেহ আমার নামও জানিত না।

** এই ইলাহী ওহীতে খোদা আমার নাম রসূল রাখিয়াছেন। কেননা বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা আমাকে সকল নবী আলায়হেস সালামের বিকাশস্থল সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং সকল নবীর নাম আমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। আমি আদম। আমি শীশ। আমি নূহ। আমি ইব্রাহীম। আমি ইসহাক। আমি ইসমাঈল। আমি ইয়াকুব। আমি ইউসুফ। আমি মূসা। আমি দাউদ। আমি ঈসা। এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামের আমি পরম বিকাশস্থল। অর্থাৎ আমি প্রতিচ্ছায়া-রূপে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহ্‌মদ (সাঃ)।

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

হযরত খলীফাতুল্ মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক গত ২৩-৪-৯৩ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত খুতবার সারাংশ।

তাশাহ্হুদ,, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى - وقوموا لله قانتين ٥ البقرة : ٢٣٩)

অর্থাৎ তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত হয়ে দণ্ডায়মান হও। (বাকারাঃ ২৩৯)

হুযুর (আইঃ) বলেন, আজ রাবওয়াতে বাৎসরিক তরবীয়তি ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। এই ক্লা.সর রীতি এই যে, সমসাময়িক খলীফা তাঁর উদ্বোধন করে থাকেন। আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, আমি যেন ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এই ক্লাসের উদ্বোধন করি। ক্লাসের অনুষ্ঠান হয়ত শুরু হয়ে গেছে তাই উদ্বোধনের অর্থ হবে যে, আমি যেন উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করি। তাই এই খুতবা জুমুআতে তাদের উপলক্ষ্য করে কিছু নসীহত করব।

হুযুর বলেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ নামাযের হেফাযত কর, দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্তী নামাযের হেফাযত কর, এবং তৃতীয়তঃ অনুগত হও। এই আয়াতে নামাযের সংরক্ষণের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো "হাফেযু" যার অর্থ শুধু মাত্র হেফাযত করা নয় বরং এর হেফাযতের জন্যে এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নামাযকে প্রত্যেক ধরনের আশংকা থেকে মুক্ত করার উপর জোড় দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক স্থায়ী পর্যবেক্ষণের পথ অনুসরণ করতে হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, এ শব্দের অর্থ ইহাও যে, যদি তোমরা নামাযের হেফাযত কর তাহলে নামায তোমাদের হেফাযত করবে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, যেহেতু তরবীয়তি ক্লাসকে সামনে রেখে কথা বলা হচ্ছে তাই আমি মনে করি প্রতিটি এমন অনুষ্ঠানে নামাযের হেফাযত করার ব্যাপারে বলার প্রয়োজন আছে। কেননা যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযতের জন্যে সচেষ্ট হবে নামাযও তার সকল মানবীয় দিকের হেফাযতের জন্য দণ্ডায়মান হবে। প্রতিটি বিপদের সময় তাকে রক্ষা করবে। কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে যে, "ওয়াসতাইনু বিস্‌সাবরে ওয়াস্‌সালাত" অর্থাৎ—বিপদের সময় ধৈর্য ও নামাযই তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। নামায তোমার ধৈর্যকে শক্তিশালী করবে আর এই ধৈর্য তোমাকে বিপদ হতে মুক্তি লাভে সহায়ক হবে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, আমরা যদি এই আয়াতে বর্ণিত "হাফেযু" অর্থাৎ তোমরা নামাযের সংরক্ষণে নিয়োজিত হও অনুযায়ী নামাযের হেফাযত করি তাহলে এই নামায আমাদেরকে এই পার্থিব জগতের সমস্যাদি ও বিপদাবলী হতে রক্ষা করবে। এই সমস্যা আত্মীয়-স্বজনের ঝগড়াঝাটি হোক বা অন্য কোন সমস্যা। নামাযের হেফাযতকারী যদি এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে, হে খোদা! আমি তোমার নির্দেশ অনুযায়ী নামাযের হেফাযত করেছি এখন তুমি আমার উপর কৃপা বর্ষণ কর ও আমাকে হেফাযত কর। তাহলে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তা'লা সে সকল বিপদাবলী হতে উদ্ধার করবেন। এভাবে আমরা খোদার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবো।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা "আস্‌সালাতেল উস্‌তা" (মধ্যবর্তী নামায)-এর হেফাযতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পূর্ববর্তী মুফাস্‌সেরগণ "মধ্যবর্তী নামাযের" ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করেছেন। কারো নিকট ফজরের নামায, কারও নিকট যোহরের নামায, কারও নিকট মাগরেবের নামায আবার কারও নিকট এশার নামায। এমনকি কারও নিকট তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু এর উত্তম অর্থ হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী মধ্যবর্তী নামায ভিন্ন ভিন্ন হবে। কারও জন্যে ফজরের বা কারও জন্যে যোহরের বা আসরের বা মাগরেবের বা এশার। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের জন্যে সুযোগ সুবিধা রেখেছেন এবং তা হতে লাভবান হওয়া পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে আত্মার প্ররোচনায় বাহনা খুঁজে তা প্রয়োগ করা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। নামায জমা' করার ব্যাপারটি বা দেরী করার ব্যাপারটিও এর অন্তর্ভুক্ত। যে কথাটি মনে রাখতে হবে তাহলো এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা নামাযকে "কিতাবাম মাওকুতা" অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করেছেন।

হুযুর বলেন, নামায সম্পর্কে যতই নসীহত করা হোক না কেন তা গুরুত্বের তুলনায় স্বল্প। এমনকি প্রতি জুমুআর খুতবায়ও যদি নামাযের জন্যে বলা হয় তবুও তা খুবই কম, একথা মনে রাখতে হবে যে, মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নামাযের সাথে সম্পর্কিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত হব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দোষত্রুটি মুক্ত হতে পারবো না। নামাযের হেফাযতের সম্পর্ক বিবেকের জাগ্রত হবার সাথে। বিবেক জাগ্রত

না হলে নামাযের হেফাযত সম্বন্ধে সচেতনতার সৃষ্টি হবে না। হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নামাযের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা জানতে পারি যে, তাদের জীবনে নামাযই ছিল হৃদয়ের প্রশান্তি। তাঁদের নামায ছিল ফলদানকারী। সুতরাং আমরাও নামাযকে হৃদয়ের প্রশান্তি হিসেবে তখন মনে করতে পারব যখন আমাদের নামায ফলদানকারী হবে। তাই নামাযের স্বাদ ভোগ করার জন্যে নামাযকে ফলদানকারী বৃক্ষে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালাতে হবে। আর এই জন্যই নামাযের হেফাযতের প্রয়োজন।

হুযুর (আইঃ) বলেন, আহমদী জামাতের বিত্তবান শ্রেণী মালী কুরবানীতে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্য হতে অধিকাংশই ফজরের নামায আদায় হতে বঞ্চিত। অনুরূপ-ভাবে অনেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থেকে ফজরের নামাযে গাফেল হয়ে যায়। টি, ভি, এবং ভি, সি, আর, প্রভৃতিতে অনেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখেও ফজরের নামাযকে নষ্ট করে। রাতে ততটুকু জেগে থাকা বাঞ্ছনীয় যেন সে সময় মত তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতে পারে ও ফজরের নামায পড়তে পারে। তাই আমার নসীহত, পরিকল্পনার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের নামাযের হেফাযত কর ও নামাযে প্রতিষ্ঠিত হও। "হাফেযু"-এর অর্থ শুধু এই নয় যে, নিজের নামাযের হেফাযত কর, এর অর্থ ইহাও যে, অন্যের নামাযেরও হেফাযত কর। সুতরাং এ ব্যাপারে অঙ্গসংগঠনগুলির দায়িত্ব অসীম। তারা যেন নিজেদের সদস্যদের নামাযে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তোমা-দের মাঝে যতই মানবীয় গুণাবলী থাকুক না কেন, তোমরা যদি নামাযী না হও তবে সে সব গুণাবলী ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে। নামাযী হবার ব্যাপারে পিতামাতার দায়িত্বও অপরিসীম, ছোট বেলা হতে বাচ্চাদের হৃদয়ে নামাযের জন্যে ভালোবাসা ও আগ্রহের সৃষ্টি না করলে তাদের নামাযী হবার সুযোগ থাকে না।

হুযুর বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্ত, আমীর বা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের প্রভাব সাধারণভাবে অধিক হয়ে থাকে। এজন্যে ঐ সকল পরিবার যারা নামাযী নয় তাদের কাছে আমার নামায সম্পর্কিত খুতবার কেসেট পৌঁছিয়ে তাদেরকে তা শুনার জন্যে বলুন। আশা করি এ খুতবাগুলি শুনার পর তাদের মাঝে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, নসীহতের মূল চাবিকাঠি হলো "রাহমাতুল্ লিল আলামিন" হওয়া (সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমত হওয়া)। আর নসীহতে উপকার হোক বা না হোক তা করে যেতেই হবে। খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ও অন্যান্য সংগঠনগুলি ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ যেন একথা মনে রাখেন যে, নিরস নসীহত কখনও ফলপ্রসূ হবে না। নসীহতের সাথে অবশ্যই মায়া-মমতা থাকতে হবে। কেউ যদি নসিহত না শুনে তবে যেন কোন অহমিকা সৃষ্টি না হয় যে, আমি কর্মকর্তা আমার কথা কেন শুনল না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে,

এরূপ মনোভাব কখনও কল্যাণকর নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সারা জীবন নসীহত করে গেছেন এবং এজন্যে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর (সাঃ) জীবনে এমন কোন ঘটনা নেই যে, নসীহত না শুনার দরুন কারও পিছনে পড়েছিলেন তিনি এই বলে যে, তাকে হেয় করতেই হবে। বরং নসীহত না শুনার দরুন তাঁর (সাঃ) হৃদয়ে ব্যাথার সৃষ্টি হয়েছে ও তার জন্যে তিনি দোয়া করেছেন। তাই এ বিষয়টিকে কুরআন উল্লেখ করেছে "লা'আল্লাকা বাখেউন নাফসাকা 'আলা আসারেহীম" অর্থাৎ তুমি কি তাদের জন্যে জীবন বিসর্জন দিবে। এই মূল মন্ত্র আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। তা হলে আমাদের নসীহত ফলপ্রসূ হবে। নসীহতের সাথে ধৈর্যেরও সম্পর্ক রয়েছে। নসীহত যখন ফল দিচ্ছে না তখন কুরআনের এই নির্দেশকে অনুসরণ করতে হবে "ওয়াসতাউনূ বিস্সাব্‌রে ওয়াস্‌লালাত"। অর্থাৎ ধৈর্য ও নামায দ্বারা (খোদার) সাহায্য অন্বেষণ কর। সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নামায অপরিহার্য। তাই আসুন আমরা নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং নসীহতের মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করি।

হুযুর বলেন, আজ বিশেষ করে আফ্রিকাতে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছে আর তাদের জন্যে বেশী বেশী নসীহতের প্রয়োজন। এই নসীহত দ্বারাই তাদিগকে নতুন জীবন দান করতে হবে। তাই আমাদের বেশী বেশী তরবীয়তি ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং নসীহত ও নামায দ্বারা নতুন জীবনের সন্ধান দিতে হবে।

(ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে শ্রুত খুতবা অবলম্বনে)

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর সালানা ইজতেমার কর্মসূচী আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে প্রচারিত করবে

	তারিখ	কর্মসূচী	সময় সূচী
(১)	২৮-৫-৯৩ (শুক্রবার)	হুযুর (আইঃ)-এর খুতবা জুমুআ ও ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ	লণ্ডন সময় দুপুর ১-১৫ মিঃ থেকে বিকেল ৩টা (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬-১৫ মিঃ থেকে রাত ৮টা)
(২)	৩০-৫-৯৩ (রবিবার)	প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ভাষণ	লণ্ডন সময় বিকেল ৩-১৫ মিঃ থেকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ (বাংলাদেশ সময় রাত ৮-১৫ মিঃ থেকে রাত ১০-৩০ মিঃ
(৩)	৩১-৫-৯৩ (সোমবার)	তাহের কাবাডি টুর্নামেন্ট (ফাইনাল)	লণ্ডন সময় বিকেল ৩-৪৫ মিঃ থেকে ৫-৩০ মিঃ (বাংলাদেশ সময় রাত ৮-৪৫ মিঃ থেকে বিকেল ১০-৩০ মিঃ

(সাপ্তাহিক বদর-এর ২২-৪-৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

আহমদী বার্তা

ঈদুলআয্হার খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

[১২ই নবুওয়ত, ১৩৫৭ হিঃ শাঃ মোতাবেক ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৯ইং মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

ঈদুলআযহা হজ্জ-ব্রতের সহিত সম্পর্কিত, এবং হজ্জের সম্পর্ক এরূপ একটি কুরবানীর সহিত, যাহা চরম পর্যায়ের সাক্ষাৎ মহব্বতের মুখাপেক্ষী, এবং সেই মহব্বত সৃষ্টি হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলীর মা'রেফত তথা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হাসিল হয়।

মানুষের উচিত সে যেন মা'রেফত হাসিলের পর নিজের গর্দান খোদার সামনে ঝুঁকাইয়া দেয় এবং তাঁহার সন্তোষেই সন্তুষ্ট থাকে।

তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর বলেন :

কুরবানীর ঈদের সহিত সর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে রহমতসুলভ বারিবর্ষণের সম্পর্ক থাকে। কখনও ঐ সম্পর্ক দৃশ্যতঃ দেখাও যায় যেমন আজ এই ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'লা আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে জাগতিক বারিবর্ষণে ভূষিত করিয়াছেন। খোদা করুন, আমাদের কুরবানীসমূহ যেন তাঁহার সমীপে সর্বদা কবুল হইতে থাকে।

এই ঈদ যাহাকে বড় ঈদ বা ঈদুল আয্হা অথবা কুরবানীর ঈদ বলা হয়, ইহা হজ্জ ব্রতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যাহা প্রতি বৎসর মক্কা মুকাররমায় পালন করা হয়, এবং এই হজ্জ-ব্রত পালন করা من استطاع اليه سبيلا অনুযায়ী প্রত্যেক সেই মুসলমানের উপর বাধ্যকর যে উহা পালনের সামর্থ্য রাখে। সামর্থ্যের প্রশ্নে অনেকগুলি জিনিস এবং অবস্থাবলী জড়িত রহিয়াছে এবং সেই বিষয়ে পূর্ববর্তীগণও পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের বিভিন্ন বক্তৃতা ও লিখায়ও সেগুলির উল্লেখ সচরাচর হইতে থাকে। সেজন্য উহার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার এখন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা বলিতে চাই যে, এই ঈদের সম্পর্ক হজ্জ-ব্রতের সহিত রহিয়াছে এবং হজ্জের সম্পর্ক এরূপ এক কুরবানীর সহিত জড়িত যাহা চরম পর্যায়ের মহব্বতের মুখাপেক্ষী। উহা ব্যতীত সেই কুরবানী পেশ করা যায় না। এবং সেই প্রকৃত ও মহান কুরবানী যাহা কোন বান্দা তাহার রবের সমীপে পেশ করিয়াছে, তাহা ছিল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই কুরবানী। কিন্তু তাঁহার দ্বারা যেহেতু জাতিসমূহকে কুরবানী পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেহেতু উহার উদ্দেশ্য তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণের সূচনা করা হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে। উহা ছিল সেই প্রথম দৃষ্টান্ত যাহা এই ধারায় কায়েম করা হয় যে, মানুষে হয়ত

ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল কিন্তু সেই তরবীয়তের প্রাথমিক সবকের সময়ে খোদাতা'লার তরফ হইতে তাঁহার ঐরূপ বান্দাগণের উপর সে ফযল নাযিল হইয়া থাকে উহার অভিব্যক্তি এইভাবে ঘটিল যে, সেই অগ্নিকুণ্ডকে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ দিলেন:

يا نار كوني بردا و سلاما (الانبياء: ٨)

('হে অগ্নি! তুমি নির্বাপিত হও এবং ইব্‌রাহীমের জন্য শান্তির কারণ হও।' শত্রু তাহার পরিবল্পনায় বিফল মনোরথ হইল এবং যে অগ্নি ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল উহাকে তাঁহার জন্য শীতল ও শান্তি স্বরূপ করিয়া দেওয়া হইল। উহা তাঁহাকে জ্বালাইল না বরং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে চরম আস্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হইল। এইভাবে হযরত ইব্‌রাহীমের গৃহে ও পরিবারে একটি দৃষ্টান্ত ও নমুনা উদ্ভাবিত করা হইল এবং তিনি তাঁহার পুত্রকে শুষ্ক তরু-লতাহীন মরু প্রান্তরে বসবাস করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন যাহা, ক্ষণিকের মধ্যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন ধরণের একটি কষ্ট ছিল না বরং আজীবন সার্বক্ষণিক মৃত্যু বরণ করার তুল্য ছিল— আগুনের মধ্যে তো কয়েক মিনিটের জন্য কষ্ট হয় তারপর মানুষের মৃত্যু ঘটিয়া যায় যদি খোদাতা'লার আদেশে আগুন নির্বাপিত ও নিরাপত্তার কারণ না হয়।

এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত হাজেরা (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কষ্ট সহ্য করিলেন। এরূপ অসহায় অবস্থায় মায়ের সর্বক্ষণ মৃত্যুকে নিজ চোখের সামনে ভাসিতে দেখা এবং শিশুর অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, তাহার কেহ ওয়ারিশ আছে কি নাই, ভয়াবহ বিপদ হইতে কেহ উদ্ধারকারী আছে কি নাই—ইহা এরূপ কুরবানী যাহার দৃষ্টান্ত জগতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার উপরই ছিল এবং খোদাতা'লার ব্যবহার তাহাদের প্রতি ইহাই প্রকাশ করিয়াছিল যে, সকল মানুষের চাইতে সর্বাপেক্ষা আদর যত্নকারী হইলেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক রব, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; তিনি তোমাদের সকল কষ্ট মোচন করিয়া একটি জাতি এখানে সৃষ্টি করিয়া দিবেন, তিনি সারা জগতের নেয়ামত আনিয়া এখানে একত্র করিয়া দিবেন এবং তোমাদের বংশধরদের উপর উন্নতিসমূহ লাভ করার দুয়ার অবারিত করিবেন এবং যখন কালক্রমে তাহারা বিকারগ্রস্তও হইবে তখনও তাহাদের মধ্যে এরূপ সুপ্ত শক্তিগুলিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বদৌলতে মানব মণ্ডলীর মধ্যে সঞ্জীবিত করা হইবে এবং যৌবনাবস্থা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে; নতুন শক্তি নব উদ্যম, সজীবতা ও উদ্দীপনা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে।

সুতরাং শুরুতে যেমন আমি বলিয়াছি—এই প্রকারের কুরবানী দেওয়া মহব্বত সৃষ্টি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর মহব্বত করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লার সিফত (গুণাবলী)-এর মা'রেফত তথা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যখন মানুষ খোদাতা'লার সত্তা ও গুণাবলীর মা'রেফত

অর্জন করে তখন সে দুইটি জিনিস লাভ করে। এক, আল্লাহ্‌র মহব্বত, কেননা খোদাতা'লার সত্তা ও গুণাবলীতে এতই সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে যে মানবাত্মা তাঁহার সহিত প্রেম না করিয়া থাকিতে পারে না। উহা বাধ্য হইয়া পড়ে খোদাতা'লাকে ভালবাসিতে। আর দ্বিতীয় জিনিস হইল এই ভয় যে আল্লাহ্‌তা'লা অতি মহান সত্তা—মহা প্রতাপশালী, মর্যাদাবান; সকল শক্তি, সৌন্দর্য ও কল্যাণের উৎস; তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা ও গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও ভীতির সৃষ্টি হয় এবং যখন প্রকৃত ও সত্যিকারভাবে তাহা সৃষ্টি হয়, তখন তাহার নাজাত বা পরিত্রাণের সকল উপায় ও সূত্র তাহার হাসিল হইয়া যায়। যে আল্লাহ্‌তা'লাকে সেইভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করে যেভাবে উল্লেখিত তরবীয়তের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে উহার সূচনাতেই হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সাহেবযাদা (পুত্র) হযরত ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন; তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের ক্ষেত্রে এত মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন এবং সেই আদর্শ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার সাহাবাও সেই রঙে রঙীন হইয়াছে। সুতরাং উম্মতে মুসলেমা আল্লাহ্‌তা'লার এরূপ লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বান্দা সৃষ্টি হইয়াছেন, যাহারা খোদাতা'লার মা'রেফতের ফলে তাঁহার সহিত প্রেম পোষণকারী ছিলেন। এবং যেহেতু তাঁহারা খোদাতা'লাকে ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন, সেইহেতু তাঁহারা দুনিয়ার কোন পরওয়া করিতেন না। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্‌তা'লার প্রেম ও ভীতি সৃষ্টি হয়, তখন উহার ফলশ্রুতি হিসাবে একটি মানসিকতার সৃষ্টি হয়। তাহা এই যে,

سمعنا و اطعنا (শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম)

অতঃপর মানুষ তাহার প্রিয়কে আর প্রশ্ন করে না বরং সে তাহাকে বলে যে, 'তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই পালন করিয়া যাইব।' কুরআন করীমে এই বিষয়বস্তুটিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পূর্বাপর সম্পর্কসূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি জায়গায় বলা হইয়াছে

وقالوا سمعنا و اطعنا

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিগণের মুখ হইতে এই কথাই নিঃসৃত হয় যে, আমরা শুনিলাম এবং মানিলাম। অর্থাৎ যখনই কোন হুকুম তাঁহাদের মনে পড়ে বা তাঁহাদের সামনে পেশ হয়, তখন এতায়াত বা মান্যতা ব্যতীত তাহাদের চরিত্রে অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না। তারপর 'সামে'না ওয়া আতানা''—এর মধ্যে قالوا শব্দে যে সর্বনাম আছে তাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন প্রযোজ্য তেমনি তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতিও প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের ঈমান এবং তদনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও ইহাই বলেন, 'হে আমাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তা রব! আমরা তোমার 'মাগফেরাত' (ক্ষমা ও পৃষ্ঠপোষকতা) কামনা করি।'

সুতরাং ইহা সেই 'এতায়াত' যাহা মহব্বত ব্যতিরেকে সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং ইহাই সেই এতায়াত, যাহা উম্মতে মুসলেমার সহস্র ও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে জগৎ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত এবং প্রীতিভরে লক্ষ্য করিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্তা মানব বিবর্তনের চরম ও পরম বিকাশ। তিনি খোদাতা'লার এরূপ এতায়াত প্রদর্শন করিয়াছেন, এলাহী মহব্বতে এমন আত্মবিলীন হইয়াছেন, খোদাতা'লার প্রীতি এরূপে অর্জন করিয়াছেন, খোদতা'লার পথে নিজের উপর মৃত্যু আনয়ন করিয়া এরূপ এক নবজীবন লাভ করিয়াছেন এবং সেই সর্বোচ্চ মাকাম ও শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছেন যে কোন মানব

সেই মাকামে উপনীত হইতে পারে নাই। তিনি জগতের সামনে এক উৎকৃষ্টতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আর পেশ করা যায় না। যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছেন তাঁহারাও নিজেদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী খোদাতা'লার আহ্কামের উপর পুরা পুরা আমল করিয়াছেন এবং সেগুলি উপেক্ষা করার বা এড়াইয়া যাওয়ার কোনই পথ তালাশ করেন নাই। এরূপ মনে হয় যেন তাঁহাদের মধ্যে এতায়াত পরিপন্থী তথা নাফরমানীর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। সেই জন্য তাঁহাদের অন্তরে খোদাতা'লার মহব্বতের সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছিল। উহার পরে তো আর প্রশ্নই উঠে না যে, মানুষ শয়তানের ন্যায় অস্বীকার ও অহংকারের পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ইহা মা'রেফতে-এলাহীরই ফলশ্রুতি, যাহা হইতেছে আল্লাহ্তা'লার মহা অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ্তা'লার মহব্বত ও খাশিয়তের ফলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

সুতরাং সার কথা এই দাঁড়াইল যে, মানুষের সকল প্রকার কুরবানীর বুনিয়াদ হইল ওয়রীয়তের সেই চূড়ান্ত বিকাশ, যাহাকে বলা হয় একই মাত্র শব্দ—'এতায়াত (আনুগত্য বা আজ্ঞানুবর্তিতা)-এর দ্বারা অভিহিত করি। আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্-তা'লা আমাদের সকলকেই এই তওফীক দান করুন যেন আমরা স্বতস্ফূর্ত মহব্বত ও আনন্দের সহিত তাঁহার আহ্কাম মান্যকারী হই। দুনিয়াতে শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও কথা মানানো হইয়া থাকে কিন্তু খোদাতা'লা মহামহিয়ান ও পবিত্রতম বান্দা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয় বরং প্রীতি ও ভালবাসা দ্বারাই তাঁহার কথা মান্য করাইয়াছেন এবং মানুষের অন্তরে প্রেম সৃষ্টি করিয়াই আদেশ পালন করাইতেন। তিনি প্রেমের দ্বারা মানুষের নিকট ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে সকল কথা তোমাদিগকে পালন করার জন্য বলা হয় সেগুলিতে তোমাদেরই ফায়দা রহিয়াছে এবং সে সব কথা বর্জন করার আদেশ করা হয় সেগুলি বর্জনে তোমাদেরই উপকার, উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের চাবি-কাঠি ও নিশ্চয়তা নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ইসলামের সংক্ষিপ্ত সার, এক কথায়—এতায়াত এবং ইহাকে বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণ করিলে এই কথাই দাঁড়ায় যে, মানুষ যেন তাহার গর্দান সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহ ভরে খোদাতা'লার সকল হুকুম ও আদেশের ছুরিকার সামনে ঠিক সেইভাবে পাতিয়া দেয়, যেভাবে কুরবানীর ঈদের বকরী উহার ঘাড় কসাইর ছুরির নীচে রাখিয়া দেয়। তেমনিভাবে মানুষের উচিত সে যেন তাহার মাথা খোদাতা'লার সামনে ঝুঁকাইয়া দেয়। কিন্তু বকরী স্বেচ্ছায় তাহা করে না। বকরীর মোকাবিলায় মানুষের অবস্থা ভিন্নতর। মানুষ সমঝদার, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীকার সম্পন্ন হইয়া থাকে; সে নিজের ইচ্ছা ও এরাদায় নিজের কল্যাণ ও ফায়দার জন্য, খোদাতা'লার মা'রেফত লাভের পর খোদাতা'লার মহব্বত ও তাঁহার ভীতির সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া খোদাতা'লার সমীপে মাথা নত করিয়া দেয় এবং বলে "হে প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাতেই আমরা সম্মত ও সন্তুষ্ট আছি।" তখন খোদা-তা'লা প্রীতি সহকারে তাঁহার এইরূপ বান্দাকে তোলেন এবং তাহাকে এতই নেয়ামত ও বরকতে ভূষিত করেন যে, দুনিয়াদার ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্তা'লা আমাদিগকে এই সবক শিখার তওফীক দিন, যাহা ঈদের সহিত সম্পর্কিত, এবং তাঁহার নেক মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এখন আমি হাত তুলিয়া দোয়া করিব। আল্লাহ্তা'লা সমগ্র জামা'তের বন্ধুদিগকে ঈদ মোবারক করুন।

(আল ফযল, ২৬শে মার্চ ১৯৭৯ই এর সৌজন্যে)

ওড়িশার ডাক

—আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী

ওড়িশার কেরেঙ্গ থেকে চিঠি এসেছে। তাদের জলসায় যাবার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ। বৈশাখ মাস ওখানে প্রচণ্ড গরম। শরীরটাও ভাল নয়, তাছাড়া দেশে অনেক কাজ। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং তারুয়ায় জলসা তাই যেতে পারব না বলে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু ওরা নাছোড় বান্দা। টেলিফোন এলো, টেলিগ্রাম এলো। আমীর সাহেব বললেন, যান। আমার সহধর্মিণী বললেন, যান। তাই বাধ্য হয়ে যেতেই হলো। ২১শে এপ্রিল পাঁচ মিনিটে ভিসা পেয়ে গেলাম, বিমানে টিকেট পেলাম দশ মিনিটে। ২২ তারিখ সন্ধ্যার পর দমদম বিমান বন্দরে গিয়ে নামলাম। কলিকাতার আমীর সাহেব এবং মোবালেগ সাহেব এসেছেন আমাকে নেবার জন্য। সময় কম, রাতেই হাওড়া থেকে পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করতে হবে। আমার আর মৌলানা হামিদ উদ্দীন শামস সাহেবের জন্য সিট রিজার্ভ করা আছে। সোজা এয়ার পোর্ট থেকে হাওড়ায় গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। সারা রাত্র গাড়ী চলল মঞ্জিলের দিকে। পরের দিন সকাল আটটায় খুরদা রোডে গিয়ে গাড়ী থামল। ষ্টেশনে কেরেঙ্গ জমাতের বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছেন। যথা সময়ে কেরেঙ্গ জমাতে গিয়ে পৌঁছলাম। ২৩ তারিখ শুক্রবার, তাই গোসল করে, একটু বিশ্রাম নিয়ে জামে মসজিদে গেলাম নামায পড়তে। কাদিয়ান থেকে এসেছেন নাযের দাওয়াত ও তবলীগ এবং মাদ্রাসা আহমদীয়ার অধ্যক্ষ। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হামিদ সাহেবের নবনির্মিত দালানে। হামিদ সাহেব খুবই যত্ন করেছেন মেহমানদের নাস্তা, খানা, শীতল পানীয়সহ সব কিছু তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সরবরাহ করেছেন। আমাদেরকে আরাম পৌঁছাবার কোন সুযোগই তিনি হাত ছাড়া করেন নি। যাজাহুমুল্লাহ্।

সন্ধ্যায় ডিস্ এন্টিনার মাধ্যমে হুযুরের (আইঃ) খুতবা প্রচারিত হবে প্রথম বারের মত। শত শত দর্শক তাকিয়ে আছেন টেলীভিশনের দিকে অপলক নেত্রে। অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে আকাশ পথে উদয় হল শেষ যুগের মসীহের (আঃ) ছবি। এরপর 'ইবনে মরীয়ম' হযরত মির্যা তাহের আহমদের (আইঃ) আগমন এবং খুতবা প্রদান প্রদর্শিত হল। টেলীভিশনে প্রথম যখন মসীহে মাওউদের (আঃ) ছবি ভেসে উঠল তখন শত শত দর্শক এক সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে কেরেঙ্গের আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে দিল। সে এক অদ্ভুত, অপূর্ব অনুভূতি যা কলম লিপিবদ্ধ করতে পারবে না। ও শুধু হৃদয় দিয়ে দেখা এবং অন্তর দিয়ে ধারণ করা যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে,—কালা ইয়াখরুজু কায়িমুনা আহ্লাল বায়তে ইয়াওমালজুমু আতে (বিহারুল আলওয়ার, জিলদ ১৩, পৃঃ ১৭৩) অর্থাৎ—ইমাম মাহদীকে (আঃ) শুক্রবার বা

জুমআর দিনে নাযিল হতে দেখা যাবে। প্রতি শুক্রবারে উপগ্রহের মাধ্যমে ইমাম মাহদীর (আঃ) নযুল আজ সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে। কী অভূতপূর্ব বিষয়! ইমাম মাহদীর (আঃ) জন্ম যেমন শুক্রবারে তেমনি তাঁর আগমন সংবাদও প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবারে সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে, অগণিত মানুষের দ্বারে দ্বারে। আকাশ পথে তাঁর পবিত্র চিত্র ভেসে আসছে বারে বারে। প্রদর্শিত হচ্ছে শ্বেত শুভ্র মিনারাতুল মসীহ্।

২৪ ও ২৫ তারিখ ছিল ওখানকার জলসা। ভারতের সর্ব বৃহৎ জমাত কেরেঙ্গ। প্রায় ছয় হাজার আহমদীর বাস। তিনটি পাকা মসজিদ গ্রামে। কোন গয়ের আহমদী নেই। সুন্দর সজ্জিত সামিয়ানা খচিত, বিদ্যুত ঝাড় বাতি শোভিত সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। হিন্দু, গয়ের আহমদী, খৃষ্টান ব্যক্তিবর্গ এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পাটনায়ক, মন্ত্রী প্রসন্ন কুমার পাটসানী, মণিপুর ও ত্রিপুরার প্রাক্তন গভর্ণর চিন্তামনি পাণিগ্রাহী এবং ডি, সি সহ বহু গণ্যমাণ্য লোক এসেছেন এই জলসায়। বিশেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ওড়িশা ডিভাইন লাইফ সোসাইটির প্রধান স্বামী শিব চিদা নন্দ সরস্বতী। ইনিই কয়েক বৎসর আগে আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য কটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

চারটি অধিবেশনে আমি তিনটি বক্তৃতা করি। একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করি। মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইংরেজী বই উপহার দেই। জমাতের পক্ষ থেকে দেয়া হয় পবিত্র কোরআনের ওড়িষা অনুবাদ। এই জলসার সংবাদ পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলীভিশনে প্রচারিত হয়েছে। বিদেশী বক্তা হিসাবে আমার বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচার করা হয়েছে।

২৬ তারিখ জলসা ছিল মানিকা গড়ায়। ২৭ তারিখে খুরদা শহরে। ২৮ ও ২৯ তারিখে কডডা পল্লীতে। ৩০ তারিখ পংকালে। এই দুই জমাতেও কোন গয়ের আহমদী নেই। ১লা মে জলসা হয় সুরুতে। একটি হাই স্কুল প্রাঙ্গণে মে দিবস উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পর সুসজ্জিত এই মঞ্চটি ঘোষণা দিয়ে তারা দিয়ে যান আহমদী জমাতের সভা অনুষ্ঠানের জন্য। ওদের বক্তব্য আহমদী জমাতের শান্তির বাণী প্রচারিত হোক, মেহনতি মানুষের মে দিবস মঞ্চ থেকে। ২রা মে জলসা হয় ভদ্রক শহরে। হিন্দু, খৃষ্টান বক্তারাও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, আমি এবার ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় শত শত মাইল সফর করে প্রায় দশ ঘন্টা বক্তৃতা দেই। আমার বক্তৃতা ইসলাম, হিন্দু ধর্ম এবং বিশেষ করে প্রকৃত জেহাদের উপর ছিল। জেহাদ সম্বন্ধে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। হিন্দু সমাজকে উত্তেজিত করা হচ্ছে লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে। ফলে আগুন ঝরছে সমগ্র ভারতে। ৩রা মে জলসা ছিল কটক শহরে। একটি অভিজাত হোটেলের আধুনিক সম্মেলন কক্ষে ছিল বুদ্ধিজীবী,

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আমাদের বক্তব্য। শহরের গণ্যমাণ্য লেখক, সামরিক অফিসার, পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাক্তন চীফ জাষ্টিস, শিক্ষাবিদ সহ বি, জে, পি, এর সভাপতি। বি, জে, পি, এর সভাপতি শর্ত দিয়ে এসেছিলেন প্রশ্ন করবেন বলে। কিন্তু আমার বক্তৃতার পর তিনি বললেন যে, তার আর কোন প্রশ্ন নেই। সব প্রশ্নেরই তিনি উত্তর পেয়ে গেছেন। সভা যখন শেষে হিন্দু নেতারা যখন চলে গেলেন তখন একজন মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার এসে আমার বক্তৃতার কিছু অংশে আপত্তি জানালেন। বুঝলাম, জেহাদ সম্বন্ধে এবং সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তার ভাল লাগেনি। জানিনা তার এই জেহাদী জোশ তিনি সভাশেষে সব হিন্দু চলে যাবার পর চুপি চুপি প্রকাশ করলেন কেন। আফসোস, দুঃখের বিষয় জেহাদের বাণী আজ বসনিয়ার বেলায় নীরব। ইরাকে, ইরানে, মিশরে, লেবাননে, কুয়েতে, আফগানিস্থানে এই জেহাদ বার বার মার খেয়েছে। আহমদীদের বেলায় পাকিস্তানে এই তথাকথিত জেহাদের ক্ষেত্র খুবই গরম। কারণ শান্তিপ্রিয় আহমদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করলে শহীদ হওয়ার ভয় নেই। মা ভৈঃ!

খলীফাতুল মসীহের (আইঃ) ১২ই ফেব্রুয়ারীর খুতবা বাঙ্গালী আহমদী এবং বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্ব বিখ্যাত করে দিয়েছে। বাঙ্গালী আজ শুধু মানুষই হয় নি উৎকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছে। এখানে এও উল্লেখ্য যে, বহুকাল আগে বিজয় সিংহ নামে এক বাঙ্গালী শ্রীলংকায় ধর্ম প্রচার করতে যান। শ্রলংকার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি নরসিংহ প্রেম দাস (নারাসিংহে প্রেমাদাসা) ঐ বাঙ্গালীরই অধংস্তন পুরুষ। বিগত সার্ক সম্মেলনে ঢাকায় তিনি এ কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন। এরপর আর কোন বাঙ্গালী প্রচারক হিসাবে বিদেশে যান নি। এর ব্যতিক্রম শুধু আহমদী জমাতের বেলায়। মরহুম খান সাহেব মোবারক আলী জার্মানীতে, মরহুম সুফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী ও মরহুম আব্দুর রহমান খান আমেরিকায়, মরহুম মৌলানা আনিসুর রহমান ইংলণ্ডে এবং মরহুম মৌলানা মুহিবুল্লাহর সুযোগ্য পুত্র মৌলানা মাহমুদ আহমদ অষ্ট্রেলীয়ায় ইসলাম প্রচার করেছেন ও করছেন। না, এই তবলীগ ডেগ ডেগচি নিয়ে মসজিদ থেকে মসজিদে মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রীতিমত মিশন স্থাপন করে এরা ইসলামের শান্তি বাণীকে প্রচার করেছেন অমুসলমানদের কাছে।

উল্লেখ্য যে, আমার এই সফর ছিল ওড়িশায় চতুর্থ তবলিগী সফর। কেরেঙ্গ জমাতের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট শেখ ইব্রাহীম সাহেব ওড়িশার দ্বার সর্ব প্রথম আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ওড়িশার আহমদীরা আজ আর আমাকে ভিন্ দেশী মনে করেন না। তারা আমাকে তাদেরই একজন মনে করে থাকেন। ওড়িশায় থাকতেই টেলিগ্রাম পেলাম, ফেরার পথে বাঁশড়া, মুর্শিদাবাদের ভগবান গোলা, বিহারের জমশেদপুর এবং ডায়মণ্ড

হারবারে জলসা করে যেতে হবে। কলিকাতায় এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। দীর্ঘ সফর এবং ঘৃতাক্ত খাদ্যের কারণে পেটের অবস্থাও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কলিকাতাতেও বাধ্য হয়ে দাওয়াত খেতে হল জনাব আমীর সাহেব, জনাব রফি সাহেব এবং জনাব শরাফত সাহেবের বাসায়। তবে আমার সুহৃদ রমযান আলী সাহেবের বাসায় মাছ, দৈ খেয়ে পেটটাকে কিছু ঠাণ্ডা করেছি। হাঁ, কটকে ডঃ আবদুল বাসেত (আমীর) সাহেবের বাসায়ও মাছ মাংস খেয়ে আসতে হয়েছিল কলিকাতা যাত্রার পূর্ব রাতে। তার অধ্যাপিকা স্ত্রী এবং স্নেহের কন্যা আদর আপ্যায়ন করে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। মানুষ যখন আদর করে কিছু খেতে দেয় তখন আমার বিষ অমৃত জ্ঞান থাকে না। সব প্রোগ্রাম বাতিল করে ৯ই মে শুধু ডায়মণ্ড হারবারে জলসা করলাম। বিগত ২৯ অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখে যখন ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদ আক্রান্ত হয় তখন তৌফিক নামে একজন আহত হয়েছেন এই সংবাদ কলিকাতার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। আর এই সংবাদ পেয়ে ডায়মণ্ড হারবার থেকে লোক দৌড়ে আসে কলিকাতায়। টেলীফোন করে তারা খবর নেন। তাই জীবিত আছি সশরীরে হাজির আছি তা দেখবার জন্যও ডায়মণ্ড হারবারে যাই।

উল্লেখ্য যে, রমযান আলী সাহেব ঘামাচির জন্য মারগো সাবান এবং প্রিকলি হিট পাউডার কিনে এনেছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে যেসব আহমদী পশ্চিম বঙ্গের এবং আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছিলেন তারা বল্লেন যে, তাদের ঈমানের খাদ্য বাংলাদেশ থেকে সরবরাহ করা হয়। বাংলা কোরআন এবং বাংলাদেশের আহমদী পত্রিকা ও বই-পত্র তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা বাংলাদেশের আহমদীদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা বাংলাদেশের জমাতের জন্য গর্বিত। তারা বললেন, আহমদী পত্রিকা তাদের কাছে বৃষ্টি সদৃশ। এই পত্রিকা না পেলে তাদের জামাতী বাগান শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ আমি যা বুঝলাম তা হল, ফারাক্কা বাঁধ যেমন পানি থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করেছে তেমনি আমরা যেন কোন বাঁধা আরোপ করে তাদেরকে আধ্যাত্মিক বারি ধারা থেকে বঞ্চিত না রাখি। বাংলাদেশের আহমদীদের কাছে এটাই তাদের নিবেদন।

একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামিয়াতের প্রধান ডঃ ওসমান গনী, ডি, লিট, আঞ্জুমানে এলেন। আমার পূর্ব পরিচিত তিনি। আমাকে তৌফিক ভাই বলে ডাকেন। এই ডাকটি ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ। তিনি বললেন, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক তার কাছে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছেন, বাংলাদেশে গিয়ে বলবেন, যারা কোরআন জ্বালায় এবং মসজিদ ভাঙ্গে আমরা ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরকে অমুসলমান বলেই জানি। যারা আহমদী মসজিদে আক্রমণ করেছে

তারা এবং বাবরী মসজিদে আক্রমণকারীরা চরিত্রের দিক দিয়ে এক। অমুসলমান মসজিদ ভাঙ্গতে পারে কিন্তু কোন মুসলমান মন্দির মসজিদ ভাঙ্গতে পারে না।

ডায়মণ্ড হারবারের জলসার পর একজন ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক এলেন মসজিদে। তিনি নামাযের ব্যাখ্যা শুনলেন আমার কাছে। শেষে তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।

এই সফরে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছি তার কয়েকটির উত্তর সহ পেশ করছি :

প্রশ্ন : কোরআনে আছে মুশরেকদেরকে যেখানে পাও বধ কর।

উত্তর : মহানবী (সাঃ) তের বৎসর পর্যন্ত মুশরেকদের অত্যাচার সহ্য করেছেন। বলেছেন—উমিরতু বিল আফু ফালা তুকাতেলু। অর্থাৎ—আমাকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নব দীক্ষিত মুসলমানদেরকে বয়কট করে তিলে তিলে মারা হয়েছে, বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে, মহানবীকে (সাঃ) পাথর মেরে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছে, তাঁর কন্যাকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে, বিপরীত মুখী উটের সঙ্গে বেঁধে ছিড়ে ফেলা হয়েছে জীবন্ত মানুষকে, জ্বলন্ত আগুনের উপর এবং প্রখর রৌদ্রে মরুভূমিতে সূর্যমুখী করে বুকে পাথর দিয়ে রাখা হয়েছে। মক্কা থেকে হিজরত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও রক্ষা নেই। মুশরেকরা আক্রমণ করেছে মদীনার দ্বার প্রান্তে। এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো,—যাদেরকে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়-ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া গেল (হজ্জ, ৪০, ৪১ আয়াত) যারা যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর তবে সীমালঙ্ঘন কর না (বাকারা ১৯১ আয়াত) মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যুদ্ধের জন্য প্রত্যাশা করবে না, যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলেই শুধু যুদ্ধ করবে, শান্তির প্রস্তাব দিলে তৎক্ষণাৎ তা মেনে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করবে, উপাসনালয় ভাঙ্গবে না, পুরোহিত, নারী, শিশু, বৃদ্ধকে বধ করবে না, ফসল বা ফলদার বৃক্ষ নষ্ট করবে না (বিভিন্ন হাদীস)। অপর দিকে গীতায় যুদ্ধক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে। ধর্মক্ষেত্রে কুরু ক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব (১ : ১) মহাত্মা কৃষ্ণ বলছেন, —যুধ্যস্ব। অর্থাৎ—যুদ্ধ কর (২ : ১৮) হতো বা প্রপ্সসিস্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্য সে মহীম। অর্থাৎ—যুদ্ধে হত হলে স্বর্গ আর জয়ে পৃথিবী ভোগ (২ : ৩৭) অথচ মহানবী (সাঃ) সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন।

প্রঃ। বাবর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করেছিলেন।

উঃ। বাবর মন্দির ভেঙ্গেছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। তবে উগ্র হিন্দুরা যে মসাজদ ভেঙ্গেছে তার সাক্ষী আজ সমগ্র বিশ্ববাসী।

প্রঃ। অযোদ্ধা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উঃ। মহাত্মা রামচন্দ্র তার রাজ্যের নাম রাখেন অযোদ্ধা। অর্থাৎ যেখানে কোন যোদ্ধা থাকবে না। অর্থাৎ—যুদ্ধমুক্ত রাজ্য। অপরদিকে আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা এসেছেন সমগ্র বিশ্বকে অযোদ্ধা বা যুদ্ধমুক্ত করতে। কারণ মহানবী (সাঃ) বলে গিয়েছিলেন—ইয়াজাউল হারব অর্থাৎ—ইমাম মাহদী (আঃ) যুদ্ধকে রহিত করবেন। তিনি অস্ত্রের পরিবর্তে কলম ব্যবহার করবেন। রাম চন্দ্রের অযোদ্ধা ন্যাশন্যাল অযোদ্ধা আর ইমাম মাহদীর (আঃ) অযোদ্ধা ইন্টারন্যাশন্যাল অযোদ্ধা।

প্রঃ। ইসলামের ইতিহাসে আছে মুসলমান আক্রমণকারীরা মন্দির ভেঙ্গেছে। লুণ্ঠন করেছে।

উঃ। মুসলমানের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাস এক নয়। ইসলাম মন্দির ভাঙ্গতে এবং লুণ্ঠন করতে নিষেধ করে। যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের আদেশ অমান্য করে থাকে তাহলে তার কর্মের জন্য ইসলাম দায়ী নয়।

প্রঃ। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উঃ। হিন্দু নামে কোন ধর্ম নেই। বেদ, উপনিষদ, মহাভারত (গীতা) রামায়ণ, পুরাণ, মনুস্মৃতি, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দু শব্দ নেই। হিন্দু নাম বিদেশীদের দেয়া। সিন্ধু থেকে হিন্দু নামের উৎপত্তি।

এমনি আরো বহু প্রশ্নের জবাব এসেছে আমার বক্তৃতা ভাষণে আলোচনায়।

তবে একটি কথার কোন জবাব ছিল না আমার কাছে। সেই কথাটি হল, পাকিস্তানে হিন্দুরা জিম্মী। বাংলাদেশেও হিন্দুদেরকে জিম্মী বানানোর চেষ্টা চলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যদি পাশ্ববর্তী দেশে হিন্দুদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানায় তাহলে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানালে আপত্তি কেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চলকে যদি ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে রামরাজ্য ঘোষণা করলে আপত্তি কেন? পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্ম যদি রাষ্ট্র ধর্ম হয় তাহলে ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হবে না কেন? এখানে এও উল্লেখ্য যে, জামাতে ইসলামী প্রভৃতি মৌলবাদী দল এ দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচরণ করলেও ওখানে তারা কথায় কথায় ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে থাকেন। ওরা যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

১১ই মে রফি সাহেব আমাকে তার গাড়ীতে করে দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছে দিলেন। বেলা এগারটায় আমাদেরকে নিয়ে বিমানটি বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করল। সমাপ্তি ঘটল বিশ দিনের কল্যাণমণ্ডিত এই তবলীগি সফরের।

ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
সদর মুরব্বী

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

অর্থ: "তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন ইহাতে মুশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন"। (সূরা সাফ্ : ১০)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদিন এই পৃথিবীতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং বিজয় লাভ করবে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, এই বিজয় হযরত মাহ্দী বা মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা সুসম্পন্ন হবে।

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, হযরত মসীহ্ এবং মাহ্দী (আঃ)-এর কর্মকাণ্ড হবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার; এমন ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী সার্বিক প্রচার যদ্বারা সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয় লাভ হয়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী নিজেও এই দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁকে শেষ যুগের সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী করে পাঠিয়েছেন যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উপরোল্লিখিত আয়াতে ইসলামের যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে সে বিজয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন।

এ বিষয়ে হাদীসসমূহে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন :—
يو شك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الحرب -

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা দেখিবে যে ঈসা ইব্নে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক, মীমাংসাকারী ইমাম মাহ্দীরূপে আগমন করিবেন। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করিবেন। শূকর নিধন করিবেন এবং ধর্মের নামে তরবারির যুদ্ধকে রহিত করিবেন। (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি আজীবন ইসলামের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বিজয় সূচনা করে গেছেন। তিনি (ক) কুরআন শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা প্রবল শক্তিশালী দলিল পত্র দ্বারা প্রমাণ করেছেন। (খ) কুরআন ও রসূল (সাঃ) এর সম্বন্ধে যত আপত্তি ও অপবাদ বিরোধীরা আরোপ করেছিল সম্পূর্ণরূপে তার খণ্ডন

করেছেন। (গ) অন্য সকল ধর্মের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। (ঘ) মুসলমানদের ভুল ধারণাসমূহকে সংশোধন করেছেন। (ঙ) মোজেযাসমূহ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিমুহূর্তে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন, আজ তেমনই আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের বিজয় দানের জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সাহেবকেও অনুরূপ সাহায্য করছেন যে কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান পাদ্রীগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ খৃঃ এদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১,০০০। অতঃপর তাদের এ সংখ্যা ১৮৮১তে ৪,৭০,০০০ এবং ১৮৮৮তে দশ লক্ষে উন্নীত হয়। মুসলমান সংভ্রান্ত পরিবারের সন্তানগণ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি, বড় বড় মুসলমান আলেমগণ খৃষ্টান পাদ্রী হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বই লিখেছিলেন। যেমন পাদ্রী আবদুল হক, পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম, পাদ্রী ইমাদুদ্দীন, ফাতেহ মসীহ প্রমুখ।

আপনারা হয়ত চিন্তা করেছেন যে, মুসলমান আলেমরা কেন খৃষ্টান হচ্ছিলেন?

ঘটনা এই যে, মুসলমান আলেমগণ এমন এমন ভুল বিশ্বাস পোষণ করতেন যার অনিবার্য ফলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

প্রথমতঃ আমাদের আমাদের আলেমগণ نسخ فی القرآن নাস্‌খ্‌ ফিল কুরআন অর্থাৎ কুরআনের অনেক আয়াতকে বাতিল বলে স্বীকার করতেন। তারা বলতেন, কুরআনের অমুক অমুক আয়াত অমুক অমুক আয়াতকে বাতিল করেছে। এমনকি অনেক হাদীস দ্বারা অনেক আয়াতকে বাতিল করেছেন। এভাবে কুরআনকে সন্দেহজনক কিতাবে পরিণত করে ফেলেছিলেন। অপরদিকে তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন যে: (ক) তিনি মৃতকে জীবিত করতেন (খ) মাটির তৈরী পাখীকে তিনি জীবন্ত করে আকাশে উড়াতে পারতেন। (গ) ফুঁ দিয়ে অন্ধের অন্ধত্ব দুর করতেন। (ঘ) বধিরের বধিরতা এবং কুষ্ঠ রোগীকে রোগ মুক্ত করতেন। সর্বোপরি এও বিশ্বাস করতেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ্‌তা'লা সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন। সেখানে সশরীরে জীবিত আছেন শেষ যুগে আবার উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে হেদায়াত দানের জন্য আকাশ থেকে নেমে আসবেন। আর মুসলমানদের মধ্যে কেহই এমন সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন না।

এসব আলেম সমাজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখেন যে: (১) হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে সর্বদা রূহুল কুদুস থাকতেন না; কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সর্বদা রূহুল কুদুস থাকতেন। তিনি শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র ছিলেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন ছিলেন না (২) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন সময় গোমরাহ্‌ ছিলেন,

পরে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে হেদায়াত দান করেন। তিনি (সাঃ) গুনাহগার ছিলেন পরে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর গুনাহ্ মাফ করেন আর এসব বিশ্বাস কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা ব্যাখ্যাও করেন। আলেমগণের এসব ভ্রান্ত আকীদার কারণে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তুলনায় ঈসা (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠতর মনে হত। পাদ্রীরা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, মুসলমানকে ঘায়েল করত। ফলে মুসলমানগণ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাকে জায়েয মনে করেছিলেন। কারণ আলেমগণের ব্যাখ্যানুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর বুযুর্গী অনেক বেশী বলে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হতো।

অপরপক্ষে বড় বড় শিক্ষিত মুসলিম নেতাগণ অদ্ভুত অদ্ভুত তফ্‌সীর করছিলেন। যেমন: স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার তফসীরে লিখেছেন: (ক) কুরআনে যে সকল ফেরেশ্‌তার কথা উল্লেখ রয়েছে বস্তুতঃ এদের কোন অস্তিত্ব নেই বরং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের বিকাশমান শক্তিসমূহ যা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বহুভাবে বিকশিত হয়ে থাকে, এই সব শক্তিসমূহের বিকাশকেই ফেরেশ্‌তা বলা হয়েছে।

(তফসীরুল কুরআন, প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা আয়নায়ে কামালতে ইসলামের ভূমিকা)

নবুওয়তের ওহী সম্বন্ধে লিখেছেন:

"আমি নবুওয়তকে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত জিনিষ বলে মনে করি, যা নবীগণের মধ্যে, তাঁদের প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য মানবিক ও শারীরিক শক্তিগুলির মতই নিহিত থাকে এবং পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়।"

(তফসীরুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের ভূমিকা)

এমতাবস্থায় মুসলমান আলেমগণ খৃষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে (বাহাসে) সহজেই পরাজিত হতেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের এহেন অবস্থা দেখে বড় ব্যথিত হলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সমস্ত জাগতিক আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রেখে নফল নামায কুরআন তেলাওয়াত ও যিক্‌র আযকারে মগ্ন থাকতেন। মির্যা সাহেব যে ইসলামের শোচনীয় অবস্থায় বড় পেরেশান হতেন তার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি:

মৌলভী ফতেহ দীন ধরম কোটা বর্ণনা করেছেন, আমি অনেক সময়ে মির্যা সাহেবের নিকট যেতাম। কখনও কখনও রাতে থাকতাম। অনেক সময় দেখতাম মির্যা সাহেব বড় অস্থির, বড় কষ্ট পাচ্ছেন। একদিন রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলাম যে, মির্যা সাহেব এত বেশী অস্থির যেমন মাছকে পানি থেকে ডাঙ্গায় তুলে রাখলে হয়; অথবা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমনটা অস্থির হয়। আমি ভীত হয়ে চুপ মেরে রইলাম। সকালে জিজ্ঞাসা করলে মির্যা সাহেব বললেন—

"যখন ইসলামের সংগ্রামের কথা স্মরণে এসে যায় এবং আজ ইসলামের উপর যে বড় বড় বিপদ আসছে, তা মনে পড়ে যায়, তখন আমার মন যেভাবে অস্থির হয়ে যায়। আর ইহা ইসলামেরই জন্য ব্যথা যা আমাকে এভাবে অস্থির করে তোলে।"

(সিরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯ তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬)

হযরত মির্যা সাহেব শিয়ালকোটে অবস্থান কাল থেকে পাদ্রীদের সাথে বহস মুবাহাসা (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করেন। তারপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন। এবং তখন বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইসলামের সাথে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন।

অতঃপর ১৮৭৫ খৃঃ আল্লাহ্‌তা'লার ইশারায় তিনি বরাবর ৮/৯ মাস যাবৎ রোযব্রত পালন করেন, কারণ ইসলামী জিহাদের জন্য বিরাট রূহানী শক্তির প্রয়োজন।

১৮৮০ খৃঃ তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে একখানা গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন যার নাম হবে 'বারাহীনে আহমদীয়া'। তিনি ধর্মীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখলেন যে, আমি কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ যে পরিমাণ সাক্ষ্য-প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপন করবো, তোমরা উহাদের সমপরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ তোমাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে (যা তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব বলে মনে কর) তোমাদের ধর্মের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন কর। যদি উহার সমপরিমাণ প্রমাণ দিতে না পার তবে উহার অর্ধেক পরিমাণ, যদি তাও না পার তবে এক তৃতীয়াংশ, অথবা এক চতুর্থাংশ, নতুবা এক পঞ্চমাংশ প্রমাণ দাও। যদি তাও না পার তবে আমার উপস্থাপিত দলিলসমূহকে খণ্ডন করে দেখাও। যদি পার তবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশের পূর্বে যারা প্রতি-উত্তর লিখবেন বলে দাবী করেছিলেন, তারা অথবা অন্য কেহই আজ পর্যন্ত বারাহীনের প্রতি-উত্তর লিখতে সাহস পাননি বা সাহস দেখাননি।

অপরপক্ষে বড় বড় মুসলমান নেতারা 'বারাহীনে আহমদীয়ার' ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন বিখ্যাত 'মনসুরে মুহাম্মদীয়ার' (বাংলোর) সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব দীর্ঘ মন্তব্য লিখেছেন যে,

".....খোদার শুকর! আমাদের আশা পূর্ণ হল। ইহা সেই গ্রন্থ যার জন্য মুসলমান-গণ দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষায় ছিলেন। ৩০০ দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে কুরআন গ্রন্থ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য। মারহাবা! কত চমৎকার গ্রন্থ যার দ্বারা ধর্মের সত্যতা প্রতি প্রহর প্রকাশ পাচ্ছে। .....এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে লা-জওয়াব"।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১৬)

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী লিখছেনঃ—"আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ, আর কোন যুগে ইসলামী জগতে ইহার তুলনা নাই"।

(এশায়াতুস সুন্নাহ্‌—৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯, সূত্রে তারিখে আহমদীয়াতঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১)

১৮৮৬ খৃঃ হযরত মির্যা সাহেব এ যুগের মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় পণ্ডিত, পাদ্রীদের সম্বোধন করে, ২০,০০০ বিজ্ঞাপন উর্দ্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে এই বিজ্ঞাপন তাদের কাছে প্রেরণ করেন। এই বিজ্ঞাপনে তিনি সকলকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ঐশী-নিদর্শন দেখাবারও আহ্‌বান জানান।

তিনি বলেন, যে কেহ আমার কাছে কাদিয়ানে এক বৎসর কাল অবস্থান করুন। যদি তাকে আমি ঐশী নিদর্শন না দেখাতে পারি তবে মাসিক ২০০ টাকা হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকব। যারা কাদিয়ানে এসে থাকবেন তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখবেন, যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে সে, আল্লাহ্‌ ইসলাম ধর্মকে সমর্থন দিচ্ছেন।

খৃষ্টান ধর্ম ছাড়াও হিন্দু, আর্য, ব্রাহ্ম-সমাজীরা হযরত মির্যা সাহেবের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন। হযরত মির্যা সাহেবের গ্রন্থ 'সুরমায়ে চশ্‌মায়ে আরিয়া' ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। হযরত মির্যা সাহেব কুরআনের আলোকে সকল ধর্মের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন।

প্রথমতঃ ১৮৯১ই সালে হযরত মির্যা সাহেবের এই ঘোষণা প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত নেই বরং তিনি মারা গিয়াছেন। এবং হাদীস শরীফে যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে, বরং তিনিই সেই ঈসা (আঃ) (রূহানীভাবে)।

এই দাবী প্রচারের সাথে সাথে চতুর্দিকে বিরোধিতার ঝড় উঠলো। মুসলমান আলেমগণের অধিকাংশ বিরোধী হয়ে গিয়ে হযরত মির্যা সাহেবকে কাফের বলে ফতোয়া দিলেন। শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বরং সকলক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। তারা হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)।

অপর পক্ষে হযরত মির্যা সাহেব শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজ দাবীর স্বপক্ষে কুরআন ও রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের আলোকে জোরালো এবং অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে থাকেন। এ সকল গ্রন্থাবলীতে কুরআন এবং রসূল (সাঃ)-এর অতুলনীয় সৌন্দর্যাবলী প্রকাশিত হয়েছে। কারণ বড় দরদ ও ব্যথাভরা পবিত্র হৃদয়ে, (এমন হৃদয়—যার উপর আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হচ্ছিল) ইসলামের ভালবাসায় তন্ময় অবস্থায় লেখা হচ্ছিল। যার ফলে মুসলমানদের ভুল ও ভ্রান্ত

ধারণাগুলি দূরীভূত হচ্ছিল এবং সাথে সাথে বিধর্মীদের আরোপিত অপবাদের খণ্ডনও হচ্ছিল। হযরত মির্যা সাহেব প্রথমতঃ 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে সবিস্তারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দেখান। পরে আরবী হামামাতুল বুশরা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে আরব দেশসমূহে প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হযরত মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন। যেমন সূরা মায়েদার শেষ রুকূ। বিশেষ করে (আয়াত নং ১১৬) "ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তনীর" সঠিক অর্থ করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণ করেন।

তিনি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ঘোষণা যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের (ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী)র অর্থ মৃত্যু নয় বরং অন্য কিছু বলে প্রমাণ দিতে পারে, তাকে ১০০০/- (এক হাজার টাকা) পুরস্কার দেবেন।

তিনি আরও ঘোষণা করেছেন ঃ—

"যদি তোমরা মুসলমানদের সকল ফিরকার হাদীস গ্রন্থসমূহ খুঁজে দেখ তবুও সহী হাদীস তো দূরের কথা, কোন ভেজাল (বানানো) হাদীসও এমন পাবে না যেখানে লেখা রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) সশরীরে এই মরদেহ নিয়ে আকাশে চলে গেছেন এবং পুনরায় কোন সময় পৃথিবীতে ফেরৎ আসবেন। যদি এমন কোন হাদীস কেউ দেখাতে পারেন তবে তাকে বিশ হাজার টাকা (২০,০০০ /-) জরিমানা দেওয়া হবে।

(রূহানী খাযায়েন ঃ ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ২২৫ ও কিতাবুল বারিয়্যার পৃঃ ১৯২ হাশিয়া)

হযরত মির্যা সাহেবের যুক্তি-প্রমাণ দেখে বহু আলেম স্বীকার করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে সশরীরে যাবার কোন মজবুত দলিল-প্রমাণ নেই। যেমন ঃ

(১) মিশরের ভূতপূর্ব মুফ্‌তী আল্লামা রশিদ রেযা বলেছেন—

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফালাস্তীন থেকে হিন্দুস্থানে গমন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করা, লিখিত দলিল প্রমাণের দিক থেকে এবং বিবেক বিবেচনার দিক থেকেও অসম্ভব নয়।

(পত্রিকা আল-মিনার ৫ম খণ্ড পৃঃ ৯০০-৯০১)

(২) আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (মিশর) রেক্টর আল্লামা মাহমুদ সালতুত এক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছেন, "পবিত্র কুরআন সুন্নতের মধ্যে এমন কোন নির্ভর যোগ্য দলিল নেই যার উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বাস করা যায় এবং নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে জীবিত আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানে এখনও অবস্থান করছেন।

(আর রেসালাহ্—১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩২ প্রকাশ ১৫ই মে, ১৯৪২)

(৩) মৌলানা আকরাম খাঁর তফসীর দেখুন—২য় খণ্ড, টীকা নং ৩৯, পৃঃ ৪৬৬-৪৭৫)

অনুরূপভাবে হযরত মির্যা সাহেব মুসলমানদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাসকে কুরআন শরীফের আলোকে সংশোধন করেছেন যাতে ইসলামের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই দিক দিয়া দেখলে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' হযরত মির্যা সাহেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

কুরআনী আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "ওয়া আইয়াদ্‌নাহু বি রূহিল কুদুস"—(সূরা বাকারা: ২৫৪)।

এই আয়াতের তফসীরে মুসলমান আলেমগণ লিখেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) থেকে কখনও রূহুল কুদুস আলাদা হতেন না। অথচ হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে তারা স্বীকার করছেন যে, হুযুর (সাঃ)-এর নিকট অনেক সময় ফেরেশ্‌তা আসতো না। দেখুন তফসীর ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, মায়ালেম, ফতহুল বয়ান, কাশ্‌শাফ, তফসীরে কবীর, তফসীরে হুসায়নী ইত্যাদি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কুরআনী আয়াত দিয়ে সুন্দরভাবে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তুলনামূলকভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে অনেক বেশী সময় ব্যাপী অধিক শক্তিশালী ফেরেশ্‌তাগণের সঙ্গ পেতেন, সহযোগিতাও পেতেন। খৃষ্টানদের এ ধারণা ভুল যে, (১) হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র (২) মানবজাতির গুনাহ্ মাফের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশে মারা গিয়ে আবার জীবিত হয়েছেন অথবা বাস্তবিকই মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌র এতবেশী নৈকট্য প্রাপ্ত যে, এ নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে কোন তুলনাই হয় না। এ বিষয়ে হযরত মির্যা সাহেব যা লিখেছেন, তা শুধু নিজে পড়েই অনুভব করা যায়। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পড়ে দেখুন।) এতে তিনি সূরা নজমের কি অদ্ভুত ও তুলনাবিহীন তফসীর করেছেন। অন্যান্য বহু আয়াতের অনন্য তফসীর রয়েছে, যার দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর উপর মহানবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানেসূরা নজমের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াতের শুধুমাত্র অনুবাদ দেয়া হলো।

"কসম নক্ষত্রটির যখন উহা পতিত হয়। তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ সাঃ) পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না। ইহা কেবল সুমহান ওহী যাহা (আল্লাহ্ হইতে) অবতীর্ণ করা হইতেছে। ... ...

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম—রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০২ হাশিয়া)।

সাধারণতঃ সব তফসীরকারকগণ আয়াত (সূরা জোহা-শেষপারা)-এর অনুবাদে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে গোমরাহ্ পেয়ে হেদায়াত দিয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন—

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) হন নি। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে এমন বিশ্বাস রাখে যে, হুযুর (সাঃ) জীবনে কখনও গোমরাহির কাজ করেছেন—সে কাফের, বেদীন, শাস্তির যোগ্য।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম—রূহানী খাযায়েন ঃ ৫ম খণ্ড, পৃঃ১৭০)

হযরত মির্যা সাহেব এই আয়াতের অর্থ করেছেন—"আল্লাহ্ তাঁকে (সাঃ) যাল্লা অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেমে আসক্ত পেলেন এবং নিজের নিকট টেনে নিলেন"। (ঐ পৃঃ—১৭০—১৭১)

এখানে মাত্র এক লাইন তুলে দেয়া হল। নতুবা বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী এই ব্যাখ্যা পড়ে দেখার মত বিষয়।

সূরা ফাতাহ্'র আয়াত—২

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر

এর অর্থ করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন রসূলে করীমের (সাঃ) গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করেছেন। অর্থাৎ রসূল (সাঃ) কখনও কখনও গুনাহ্ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

আমাদের বিশ্বাস যে, রসূল (সাঃ) পরম পবিত্র নিষ্পাপ আত্মা। তাঁর গুনাহ্ করা অকল্পনীয়। মুসলমান আলেমগণ হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি নিষ্পাপ, শয়তানের স্পর্শের বাইরে। অথচ রসূল করীম (সাঃ)-কে গুনাগার বলতে তারা ভয় করেন না। এই আয়াতের আসল অর্থ এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরোধিতায় অন্যেরা যে সব গুনাহ্ করেছে বা করবে, তাদের সেই গুনাহ্ আল্লাহ্তা'লা রসূলের (সাঃ)-এর খাতিরে মাফ করবেন। যেমন মক্কা বিজয়ের পর রসূল (সাঃ) মক্কার কাফেরদেরকে মাফ করেছিলেন। আল্লাহ্ এখানে বলেছেন এমন গুনাগারদের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। আর আরবী সাহিত্যের নিয়ম মতে এমন অনুবাদ একেবারেই যথাযথ এবং সিদ্ধ।

'নাস্খ ফিল কুরআন' সম্বন্ধে মুসলমান আলেমগণ তফসীরে লিখেছেন যে, কুরআনের অমুক অমুক আয়াত পরবর্তীতে বাতিল হয়েছে। এমন কি কোন কোন আলেম কোন হাদীস দ্বারাও কুরআনের আয়াতকে বাতিল করেছেন। যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণ চেষ্টা করেছেন ঐ সব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উদ্ধার করতে। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে তা করতে পারেন নি।

হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন সিউতি (রহঃ) শেষ পর্যন্ত ১৫টি আয়াত এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী ৫টি আয়াতকে বাতিল বলে স্বীকার করেছেন। (দেখুন ফাউযুল কবীর) হযরত মির্যা সাহেব বললেন—অসম্ভব! কুরআনের কোন আয়াত তো দূরের কথা, একটি শব্দ বা যের-যবরও বাতিল হতে পারে না। তিনি ঐ সব জটিল আয়াতের বড় গভীর মাহাত্ম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্ হামদুলিল্লাহ্। তিনি দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত আলেম মিলিত চেষ্টা করেও তাঁর মতো নির্ভুল ও দুর্লভ তফসীর করতে সক্ষম হবেন না। প্রমাণ স্বরূপ চ্যালেঞ্জ সহকারে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে, সূরা ফাতেহার তফসীর এক অপূর্ব ও অতুলনীয় তফসীর যা সর্ব কালের জন্য অনতিক্রমণীয় রয়ে যাবে।

হযরত মির্যা সাহেবের আক্রমণাত্মক যুক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবিলায় খৃষ্টান পাদ্রীরা পরাজয় করতে এবং পিছ্‌পা হতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে হিন্দু আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজীরা সকলেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। মুসলমান নেতাগণও মুক্ত মনে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের পক্ষে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদাই বিজয়ী হয়েছেন। এখানে বিধর্মী ও স্বধর্মীদের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হলো :

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে খৃষ্টান পাদ্রীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে লর্ড বিশপ অব গ্লষ্টার রেভারেণ্ড চার্লস এলিকট তাঁর সভাপতির ভাষণে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন :

ইসলামে এক নব জাগরণের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। যারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা জানিয়েছেন যে, বৃটিশ রাজ্য হিন্দুস্থানে আমরা এক নতুন ধরনের ইসলামের সম্মুখীন হচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের এই দ্বীপেও কোথাও কোথাও এর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইসলাম ঐ সব বিদায়াতের শক্ত বিরোধী যে সব বিদায়াতের কারণে মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্ম আমাদের চোখে ঘৃণার পাত্র ছিল। এই নব জাগরণকে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন ইসলাম এমন যে, ইহা শুধু আত্ম রক্ষাই করে না, বরং প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণও করে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরও কেউ কেউ ঐদিকে ঝুঁকে পড়েছে।

(দ্যা অফিশিয়াল রিপোর্ট অব দি মিশনারীজ কনফারেন্স অব দি এংলিকান কমিউনিয়ন ১৯০৪, পৃঃ ৬৪)

সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেব, সম্পাদক তাহযিবে নিসওয়া পত্রিকা লিখেছেন : (লাহোর ১৯০৮ইং)

'মরহুম মির্যা সাহেব অত্যন্ত পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর নেকীতে এত শক্তি ছিল যে, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দিত। তিনি মহাজ্ঞানী আলেম শক্তিশালী সংস্কারক এবং পবিত্র জীবনাদর্শের অধিকারী ছিলেন। আমরা তাঁকে ধর্মীয়ভাবে মসীহ মাওউদ মানিনা কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনা মুত্ত আত্মাসমূহের জন্য প্রকৃতপক্ষে মসীহীই ছিল।''

লাহোরের পয়সা পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন : মুসলমানগণ নিশ্চিত থাকুন মির্যা সাহেব কোন দিন ইসলামের ক্ষতি করতে পারবেন না। আমাদের বিশ্বাস মতে তিনি এমন ক্ষমতা রাখেন না। যদি হিন্দু ও খৃষ্টানগণ মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তবে শোভনীয় হত কারণ মির্যা সাহেবের সকল প্রচেষ্টা হিন্দু, আর্য ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের পক্ষে ব্যয়িত হচ্ছে। যেমন তাঁর গ্রন্থ ''বারাহীনে আহমদীয়া'', সুরমায়ে

চশমায়ে আবিয়া" ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। ওমা আলায়না ইল্লাল বালাগ। এতটুকু বলে রাখি যে, আমরা হযরত মির্যা সাহেবের অনুসারী নই।

(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২ইং পয়সা লাহোর)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৬-২৭-২৮শে ডিসেম্বর লাহোরে তিন দিন ব্যাপী এক সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের আলেমগণ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে পূর্ব নির্ধারিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর পড়ে শোনান। এ অনুষ্ঠানে হযরত মির্যা সাহেবকেও তাঁর রচনা পড়ে শোনাবার আহ্বান করা হয়। ঐ নির্ধারিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে রচনা পড়ে শোনান, তা "ইসলামী নীতি দর্শন" নামে বঙ্গানুবাদ করে পুস্তকাকারে বহুদিন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। মির্যা সাহেবের রচনা পাঠ শেষ হবার আগেই জলসার সময় শেষ হয়ে যায়। তখন উপস্থিত বিমুগ্ধ জনতার দাবীতে বাধ্য হয়ে জলসার ব্যবস্থাপকগণ শুধু এই মহামূল্য প্রবন্ধটি শেষাবধি শোনার জন্য পরদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেন। হযরত মির্যা সাহেব পূর্বের থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর লেখা রচনাটি "ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি" বাকী সকল প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। জলসায় ৩য় ও ৪র্থ দিন যখন মির্যা সাহেবের এ রচনা পাঠ করা হচ্ছিল তখন বিরাট জনসমাগম হয়েছিল মুহুর্মুহু 'মারহাবা' ধ্বনিতে সম্মেলন স্থল মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সভা শেষে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, নিঃসন্দেহে মির্যা সাহেবের রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়। সেদিন সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই সম্মেলনের রিপোর্ট বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্মেলনের শেষে সকল বড় বড় পত্রিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোড়ালো ভাষায় হযরত মির্যা সাহেবের রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। পত্রিকাগুলির সকল রিপোর্ট একত্রে প্রকাশ করতে গেলে নিঃসন্দেহে বহু পৃষ্ঠার একখানা বই হবে। অতএব এখানে কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হল।

কোলকাতার পত্রিকা "জেনারেল ওয়া গওহরে আসফি ২৪শে জানুয়ারী ১৮৯৭ইং তারিখে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে— "মহতী জলসা লাহোর এবং ইসলামের বিজয়"

.....জলসার কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণ হয় যে, একমাত্র কাদিয়ানের রইস জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবই ছিলেন যিনি ঐ প্রতিযোগিতার ময়দানে ইসলামী মহযুদ্ধের পুরা দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেছেন এবং তাঁকে ইসলামের উকিল নিযুক্তির সম্মান তিনি পুরাপুরি রক্ষা করেছেন। পেশওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলাম, শাহপুর, ভেরা, খোশাব, শিয়াল কোট, জম্মু, ওজিরাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধয়ানা, শিমলা, দিল্লী, আম্বালা, পাটিয়ালা রাজ্য, কপুরথলা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ, বাঙ্গালোর ইত্যাদি নগরীসমূহ থেকে তাঁকে ইসলামের উকিল নিযুক্ত করা হয়েছিল। সত্য কথা বলতে হয়

যে, উক্ত জলসায় যদি হযরত মির্যা সাহেবের রচনা না থাকত তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে মুসলমানদের শরম ও লজ্জা পেতে হত। কিন্তু আল্লাহ্‌র শক্তিশালী হাত সেদিন ইসলামকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং ঐ রচনার কারণে এমন এক বিস্ময় লাভ হল যে, আপন তো বটেই অপর বিরোধীরাও স্বভাবগত সততার কারণে বলে উঠলেন, "এই রচনাই শ্রেষ্ঠ ছিল.....। যদিও এটা মহতী ধর্মীয় জলসা ছিল, কিন্তু এর শান-শওকত বাকী অন্যান্য সকল কংগ্রেস ও কনফারেন্সের গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। হিন্দুস্থানের বড় বড় এলাকার রইসগণ উপস্থিত ছিলেন। জলসার পরিচালনার জন্য ছয়জন ভারতবরেণ্য বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিযুক্ত ছিলেন।.....

(তারিখে আহমদীয়াত: ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৩)

পত্রিকা চৌদ্দুই সাদী রাওয়ালপিণ্ডি লিখেছে—হযরত মির্যা সাহেবের রচনা সম্পর্কে .....জীবনভর কোন কর্ণ এমন সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করেনি। অন্যান্য ধর্মের বক্তারাও বক্তৃতা করলেন। সত্যি বলতে কি, তাঁরা নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দেন নি। সাধারণতঃ চতুর্থ প্রশ্নের উপরই থাকলেন।.... শুধুমাত্র মির্যা সাহেবের বক্তৃতায়ই প্রত্যেক প্রশ্নের পৃথক ও বিস্তারিত উত্তর ছিল এবং উপস্থিত সকলে একান্ত মনোযোগ সহকারে মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করেছেন এবং এই বক্তব্যকে মহা মূল্যবান বলে মনে করেছেন। আমরা মির্যা সাহেবের মুরীদ নই কিন্তু আমরা ইনসাফকে (ন্যায় বিচার) খুন করতে পারি না।...মির্যা সাহেবের বক্তৃতার...অপূর্ব সৌন্দর্য ছিল...মির্যা সাহেবের বক্তৃতা এবং অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় জনতা এইভাবে ভীড় করেছিল যেন মৌমাছিরা মৌচাকের সাথে ভীড় জমায়। কিন্তু অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার সময় শ্রোতারা বসে থেকে থেকে উঠে চলে যেতেন।...যাই হোক না কেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যে, এই জলসায় ইসলামের বিজয় হয়েছে। সকল বিধর্মীদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও মুখে কেহ স্বীকার করুন বা না করুন।...

(১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ইং, তারিখে আহমদীয়াত: ২য় খণ্ড; পৃ: ৩৯০)

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০-২১-২২ জুন তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০তম সিংহাসন আরোহণ বার্ষিকীতে জুবিলী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। সেদিন হযরত মির্যা সাহেব "তোহ্‌ফায়ে কায়সারিয়া" নামক গ্রন্থ লিখে ইহাতে মহারাণীকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী—ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'ত আল্লাহ্‌র নির্বাচিত একজন খলীফার নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র তৌহীদ ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেসালত প্রচার করতে দিনরাত ব্যস্ত রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষকে কুরআনের মর্মবাণী শেখাবার নিমিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। শতাধিক ভাষায় আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী (হাদীস) প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছে।

সকল জাতীর মানুষ আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চেষ্টার ফলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হচ্ছে। দেশ বিদেশে হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত আযানের ধ্বনি উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। এক কালের ত্রিত্ববাদীর মুখে আজ তৌহীদের আযান উচ্চারিত হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফত তথা মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর খেলাফত নিঃসন্দেহে আজ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ফযলে অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, পাদ্রী বা পণ্ডিত আহমদীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বহস-মোবাহালা (তর্ক-যুদ্ধ) করতে সাহস করে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং ইসলাম সেবার মান কত উন্নত পর্যায়ের কত গভীর এবং কত সুদূর প্রসারী! হযরত মির্যা সাহেব বলেছেন:

"তুমি ঐ করুণাময় রসূল (সাঃ)-এর প্রতি প্রত্যহ শত শত বার দরূদ পাঠ কর। পুনঃ পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) নবীগণের প্রধান"। (দুরে সামীন উর্দু)

তিনি আরো বলেছেন:

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল এবং শাফায়াত-কারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবান্বিত নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার"। (আমাদের শিক্ষা, কিশ্‌তিয়ে নূহ)

তাঁর মহামূল্য উপদেশ:

"আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধচিত্তে পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে।"

(রূহানী খাযায়েন: ১ম খণ্ড, আইয়ামুস সুলেহ: ৩২৫ পৃঃ)

পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

আসছে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই ঈদ মুবারক। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ-এর কুরবানীর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা

ইসলামে সামাজিক জীবন

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, 'নারী কখনও নবী হতে পারে না'। এক কথায় ইহার সহজ উত্তর এই যে, নবী কখনও নবীর মা হতে পারে না। ইসলামে "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" তবে ইহা সর্ত সাপেক্ষ। মায়ের পা দুখানি বেহেশ্‌তের দ্বার প্রান্তে থাকতে হবে। অর্থাৎ মা স্বয়ং আদর্শ সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে আগামী দিনের নাগরিক সন্তান সন্ততিদেরকে আদর্শ শিক্ষায় সচ্চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলে ইহজগতেই বেহেশ্‌তী জীবন যাপনের নমুনা পেশ করতে হবে। এ দায়িত্বটি বহুলাংশে নারী জাতির উপরই নির্ভর করে। পাক কালামে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা তাহরীম) হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মলাভ করে মুসলমান অবস্থায়। পিতামাতাই তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টান বা মাজুসী (অগ্নি উপাসক) বানায়।" "নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেওয়া একমন শস্য ভিক্ষা দানের চেয়ে বেশী উৎকৃষ্ট"। "যে সুন্দরী বিধবা সন্তানদের মানুষ করবার প্রয়াসে আপন সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে তার বর্ণ ও গণ্ডাদেশ কালো করেছে, পরলোকে সে ও আমি এমন নিকটবর্তী হবো যেমন আমার হাতের দু'টি আঙ্গুল।" শিশুদের মন প্রাণ রত্নের মত উজ্জ্বল এবং মোমের ন্যায় কোমল। এখন তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে, নির্মল, নিঃকলঙ্ক, পরিষ্কার ও নিষ্পাপ থাকে এই অবস্থায় তাকে যে ছাঁচে ঢালা যাবে, সে ছাঁচেই গড়ে উঠবে তার ভবিষ্যত জীবন। তাদের হৃদয় উর্বর ভূমির ন্যায়। যে কোন বীজ উহাতে বপন করা হউক না কেন, অনায়াসে অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। কোমল মতি শিশুর এই অবস্থায় সততা, সাধুতার বীজ বপন করতে পারলে অর্থাৎ শৈশব কালে শিশুকে কথা, কাজ আচার ব্যবহার আদব তমীজের সাথে আদর্শ শিক্ষায় উৎকৃষ্ট চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যত জীবনে সে হবে সৎ সাধু এবং পুণ্যবান। পক্ষান্তরে শিশুকে লালন পালনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে পুণ্যের বীজ বপন করতে না পারলে ইহকাল পরকাল উভয় কালে সে হবে হতভাগ্য। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নাম মানব জীবন নহে। মানুষ যেমন আহার করে নিদ্রা যায় এবং তার কাম সুলভ শক্তিকে চরিতার্থের দ্বারা সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে থাকে তদ্রূপ চতুষ্পদ জন্তুরাও আহার করে, নিদ্রা যায় এবং তার কাম শক্তিকে চরিতার্থের দ্বারা বাচ্চা পয়দা করে থাকে, এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ আর চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে পার্থক্য কি? পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো সদগুণাবলী। স্নেহ, দয়া, প্রেম প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির উৎস হলো মানুষের

হৃদয়। তাই হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বুকের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলেছেন, পরহেযগারী এইখানে, পরহেযগারী এইখানে, পরহেযগারী এইখানে। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো তার হৃদয়কে স্বচ্ছ নির্মল ও পবিত্র করতঃ সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশকে মেনে চলা। পাক কালামে আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনকে বলেন, "তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণার্থে তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে"। সমাজের কোন ব্যক্তি যদি সৎ, সাধু এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে তার কথা কাজ আচার ব্যবহার হবে উৎকৃষ্ট। তার দ্বারা সমাজের কল্যাণ হওয়া ছাড়া কখনও অন্যায় অবিচার যুলুম নির্যাতন ইত্যাদি অসৎ কর্ম সংঘটিত হতে পারে না। সে নিজে যেমন সৎ সাধু তদ্রূপ অপরকেও সৎ এবং সাধু বানাতে চেষ্টিত হয়। একটা প্রদীপ যেমন আরেকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, অবিকল তদ্রূপভাবেই একজন আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তির সংস্পর্শে সমাজ জীবন হয় পুণ্যময় ও আদর্শবান। ব্যক্তি থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে উঠে, যার ফলে গড়ে উঠে আদর্শ জাতীয় জীবন। সে সমাজে থাকবে না অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, উৎপীড়ন, শোষণ-যুলুম হত্যা, মারামারি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের অস্তিত্বকে বিক্রয় করে দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল" (সূরা বাকারা) "এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট সংরক্ষিত আছে" (বাকারা)। খোদা-ভীরু সৎ সাধু ব্যক্তিগণ দুনিয়াদারীর লোভ লালসার মোহে অথবা কোন পদ প্রাপ্তির লালসায় পতিত হন না। হৃদয়ের বিশ্বাস, সরলতা, মানব-প্রেম ও খোদাভীতি তাদিগকে সৎ ও সাধু বানায়। রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা বা আইনের ভয়ে মানুষের মনে পবিত্রতা ও সাধুতার সৃষ্টি করতে পারে না। সৎ সাধু ব্যক্তিগণ একমাত্র মহান আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবেকের তাকিদে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য সাধনে যত্নবান হন। তাঁরা মহান আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ ও উপদেশ সামাজিক বাস্তবায়ন করেন। মানুষের হিত সাধন করাই তখন তাঁদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যার দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধিত হয়"। তিনি আরো বলেছেন, "শুধু উপকারী স্বজনের প্রত্যুপকার করলে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে সুদক্ষ হওয়া যায় না, তা হয় যারা উপকার করে না তাদেরও উপকার সাধন করলে"। এইরূপ খোদাভীরু সৎকর্মশীল সৎ সাধুগণ, যাঁরা মানব সমাজের কল্যাণে নিজেদের সময় ও অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন, তাঁদের আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে, "পৃথিবীর উত্তরাধিকার আমার নেককার বান্দাগণের হাতে আসবে" (সূরা আম্বিয়া)। প্রশ্ন আসে যে, অন্যায়কারীকে বিচার

(অবশিষ্টাংশ ৪১ পৃঃ দেখুন)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ

—কে, এম, মাহমুদুল হাসান

উনিশশ' উনসত্তর সালে ২০শে জুলাই মানুষ যখন চাঁদে পদার্পণ করেছিল, তখন এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী কেউ কেউ তা অবিশ্বাস করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, যে চাঁদ দেখে আমরা রোযা রাখি, ঈদ করি, সেই পবিত্র চাঁদেই মানুষ গিয়ে পা স্পর্শ করল? এও কি সম্ভব? অথচ ঘটনাটি সত্যি সত্যই ঘটেছিল। ক'দিন আগেও কে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাফল্য বা টেষ্টটিউব বেবীর জন্ম লাভের সম্ভবনার কথা ভেবেছিল? অথচ এগুলো আজ সংঘটিত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এগুলো ঘটা সম্ভব। তাই প্রথমেই যাকে অসম্ভব বলে মনে হয়, তা যে অসম্ভবই রয়ে যাবে এমনটি নয়। তেমনি একটি বিষয় হ'ল বিনা পিতায় জন্মলাভ সংক্রান্ত। পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষ একজন মানুষের (যীশুর) বিনা পিতায় জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। তারা ভাবছেন, বিনা পিতায় জন্মগ্রহণকারী যীশু ছিলেন ঈশ্বর পুত্র। অথচ (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ীই) আদম বিনা পিতায়ই শুধু নয়, বিনা মাতায়ও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন—অথচ তিনি ঈশ্বর পুত্র নন। কি বিচিত্র বিশ্বাস! ঈশ্বর যীশুতে এসেই থেমে গেলেন। তাঁর আর বংশবৃদ্ধির (নাউযুবিল্লাহ্) প্রয়োজন হ'ল না। কাজেই বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণের সম্ভাব্যতার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দুনিয়ার বিরাট সংখ্যক মানুষ বিষয়টি বুঝতে না পেরে পথ হারিয়ে ভুল আঁকড়ে ধরেছে। তাই ধর্মীয় বিশ্লেষণের পাশা-পাশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিয়য়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন।

উচ্চতর জীববিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই 'অপুংজনি' বা 'পারথেনো জেনেসিস' শব্দটির সাথে পরিচিত। ডিম্ব (স্ত্রী জনন কোষ) যখন নিষিক্ত না হয়েই অর্থাৎ পুংজনন কোষের সাথে মিলন ছাড়াই পরিপূর্ণ জীবে পরিণত হয়, তখন এ ধরণের জনন পদ্ধতিকে বলা হয় "পারথেনোজেনেসিস"। পারথেনো জেনেসিস পদ্ধতিতে জন্ম লাভকারী প্রাণী অন্যান্য যৌন জনন পদ্ধতিতেও বিস্তার লাভে সক্ষম। বিজ্ঞানীদের ধারণা ডিম্ব কোষে প্রাণী জীবনের প্রারম্ভিক উন্মেষ ও পরিণতি লাভের উপকরণসমূহ আছে, শুক্রাণু এ উন্মেষকেই সক্রিয়তা দান করে। স্পাইরোগাইরা শ্রেণীর শ্যাওলা, মৌমাছি, বোলতা, খরগোশ প্রভৃতি অনেক জীবেই এ পদ্ধতির সাফল্য পরিলক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রেই এটি সচরাচর ঘটেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল মানুষের ক্ষেত্রে এটি ঘটছে—এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? তাই বিষয়টি ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

এ বিষয়ে আমেরিকান মেডিক্যাল জার্নালে বলা হয়েছে—"চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা স্বাভাবিক "পারথেনো জেনোসিসের অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই কোন মহিলার সন্তান জন্ম দানের সম্ভাব্যতাকে উড়িয়ে দেন নি। এ জাতীয় বক্তব্যকে কোন রকমের চিন্তাভাবনা ছাড়াই অসম্ভব হিসেবে উপহাসের যোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ জীববিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এর সম্ভাব্যতাকে অবজ্ঞা যায় না। মহিলাদের তলপেটের অংশ বা নিম্নাঙ্গে কখনো কখনো প্রাপ্ত এ্যারেনোব্লাষ্টোমা (স্ত্রী এবং শুক্রানু-এর গ্রীক প্রতি শব্দ থেকে উদ্ভূত) নামক বিশেষ ধরণের টিউমার সৃষ্টির মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতার কথা ডঃ টিমি উল্লেখ করেছেন। এসব টিউমার পুংজনন কোষ উৎপাদনে সক্ষম। স্বভাবতঃই এসব পুংজননকোষসমূহ যদি জীবিত ও সক্রিয় থাকে এবং মহিলার নিজের ডিম্বকোষ বা 'ওভাম' এর সংস্পর্শে আসে তবে গর্ভধারণ ঘটতে পারে। এ জাতীয় চিন্তার মধ্যে অযৌক্তিক কিছুই নেই। ডঃ টিমি উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপে ২০টি ক্ষেত্রে এ্যারেনোব্লাষ্টোমা কর্তৃক পুংজনন কোষ উৎপাদনের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে ..... ।

যদি এ্যারেনোব্লাষ্টোমা দ্বারা স্ত্রীদেহে পুংজনন কোষ উৎপন্ন হয় তবে একজন মহিলার ক্ষেত্রে, এমন কি কুমারী হলেও, স্বনিষেক বাতিল করা যায় না। এর অর্থ দাঁড়ায়, চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় বা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পুরুষের দেহ থেকে পুংজনন কোষ মহিলার দেহে স্থানান্তরের ফলে যা ঘটা সম্ভব, তা তার নিজ দেহের মধ্যেই ঘটতে পারে।" দি ট্রানজেকশনস্ অব দি এ্যমেরিকান নিউরোলজিকাল এ্যসোসিয়েশন (৬০ খণ্ড-১৯৩৪)-এ বলা হয়েছে, "বার্লিনের অধ্যাপক রবার্ট মেয়ার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইউরোপ থেকে ২৬টি এ্যারেনোব্লাষ্টোমা চরিত্রের টিউমারের ঘটনা সংগ্রহ ও রিপোর্ট করেছেন"। এ প্রসঙ্গে আরও সুনির্দিষ্টভাবে লিখছে এনোমালিস এণ্ড কিওরিওসিটিস অফ মেডিসিন (জর্জ এম, গোল্ড এবং ওয়াল্টার এল, পাওয়েল)—"পিতা ছাড়াই সন্তান জন্মানোর অনেক ঘটনাই রয়েছে। অত্যন্ত উন্নত নৈতিকতার অধিকারী একটি মেয়ে কোন প্রকার ধারণা ছাড়াই গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। যথাযথভাবে গঠন লাভকারী একটি শিশু কন্যার জন্মদানকারী একজন অবিবাহিতা মহিলার গর্ভবতী হবার ঘটনাও রয়েছে, যিনি অপরাধমূলক কোন রকম সংশ্রবের দাবী সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ করেছিলেন।" আসলে এ ধরনের ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটলেও সামাজিক নানা কারণে তা ব্যাপক প্রচার লাভ করে না।

কাজেই এটি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ মোটেই প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়—বরং পৃথিবীতে অনেক মানুষই এ পদ্ধতিতে জন্ম নিয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এটি মহান আল্লাহ্‌র মহিমা বিকাশের একটি বিশেষ রূপ। তাঁর অনধিগম্য প্রজ্ঞাকে স্পর্শ করা মানুষের সাধ্যাতীত। সমস্ত প্রশংসাই বিশ্ব জগতের একমাত্র

অধিপতি মহান আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি এই শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রেরণ করে সব মিথ্যে খোদার অনুসরণ থেকে মানব জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এবং সকল সত্যের মোহনায় পৌঁছে দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

(১) Possibility of Virgin Births
The Review of Religions, January 1986—লণ্ডন (যুক্তরাজ্য) থেকে প্রকাশিত।

(২) Graw Hill Concise Encyclopedia of Science & Technology (m-c) —১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত।

(৩) The World Book Encyclopedia, Volume 16 ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত।

(৪) মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্ব কোষ, প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭২।

(৩৮ পৃঃ পর)

না করে ছেড়ে দেওয়া কি সদ্‌গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত? আইনের চোখে আত্মীয় অনাত্মীয় নেই, সকলেই সমান। স্থান কাল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের আলোকে বিচার করতঃ অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে হবে। আইনানুযায়ী কাউকে বিচার না করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ইহাই ইসলাম শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামের কর্মকাণ্ডে কারো উপর দায়িত্বভার অর্পণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে যোগ্য ব্যক্তির উপর কর্মভার অর্পণ করতে আদেশ করেছেন, যখন তোমরা যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করবে, তখন ন্যায়ের সাথে বিচার করবে"।

বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন জাতি এজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তারা কাউকে দরিদ্র বলে শাস্তি দিয়েছে, আবার কাউকে ধনী বলে ছেড়ে দিয়েছে, খোদার কসম যদি আমার কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো আমি তারও হাত কেটে দিতাম"। ইসলামে উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র নেই। আল্লাহ্‌র নিকট তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যিনি সচ্চরিত্রবান ও ধার্মিক।

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা !

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার রহমতে কুশলেই আছ। অনেকদিন পর আবার তোমাদের কাছে লিখতে বসলাম। আমার পত্র তোমাদের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঈদুল আযহা তোমাদের দোর গোড়ায় এগিয়ে আসবে তাই তোমাদেরকে জানাই আগাম 'ঈদ মোবারক'। এই ঈদ তোমাদের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক অনেক অনেক আনন্দ আর কর্মপ্রেরণা। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানীর মহান আদর্শ তোমাদের জীবনে আনুক সেই উদ্যম ও উৎসাহ যাতে তোমারাও বর্তমান কালে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পথে নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত কুরবানী করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকতে পার। আর এ সমস্যাসংকুল ধরায় শান্তির প্রেম-সুধা বিলাতে পার।

আজকে তোমাদের জন্যে থাকছে কুরবানী সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন-উত্তর। এগুলো জেনে রাখলে তোমাদের অনেক কাজে লাগবে ভবিষ্যৎ জীবনে। আজকের মত তাহলে আসি কেমন, খোদা হাফিয।

ইতি

'তোমাদের নানা ভাই'

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : কুরবানী শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর : কুরবানী আরবী 'কুর্‌ব' শব্দ থেকে আসছে যার অর্থ নৈকট্য। কুরবানী অর্থ হল যে আমল বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় তাকে কুরবানী বলে।

প্র : আমরা কেন কুরবানী করে থাকি ?

উ : আল্লাহ্‌র এক মহান নবী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর এক-অদ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর উদ্দেশ্য যবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। (সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত: ১০৪ আয়াত)। এই পুণ্য স্মৃতিতে জাগরূক রাখার জন্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

এর সুন্নত মোতাবেক আমরা প্রতি বৎসর যিলহজ্জ মাসের ১০-১২ তারিখ পশু যবাই-এর মাধ্যমে এই কুরবানী করে থাকি. ইহা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্যে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ও ওয়াজিব।

প্র : শাহ্‌রুল হারাম কি ?

উ : মহর্‌রম, রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্জ মাসে মসজিদুল হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবি নিষেধ তাই এই মাস চারটিকে শাহ্‌রুল হারাম বা নিষিদ্ধ মাস বলে।

প্র : 'আইয়ামুত্‌ তাশ্‌রিক' কি ?

উ : 'আইয়ামুত্‌ তাশরিক' অর্থ গোশ্‌ত শুকানোর দিন। ১১, ১২, ও ১৩ই যিলহজ্জকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়াও ঈদুল আযহার দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ এবং তৎপরবর্তী ৩ দিন রোযা রাখা নিষেধ। কিন্তু যে হাজী কুরবানী দিতে পায় না সে ঐ তিন দিন রোযা রাখতে পারে।

প্র : যিলহজ্জ মাস আসলে একজন কুরবানী দাতার কি কি করণীয় আছে ?

উ : যিনি কুরবানী দিবেন যিলহজ্জ মাস আসলে কুরবানী দেয়ার আগ পর্যন্ত চুল, নখ ইত্যাদি কাটবেন না এবং কুরবানীর দিন ফজর থেকে কুরবানী দেয়ার আগ পর্যন্ত রোযা রাখবেন। সম্ভব হলে কুরবানীর গোশ্‌ত দ্বারা ইফতার করবেন। আঁ-হযরত (সাঃ) এরূপ ইহাই সুন্নত।

প্র : আঁ-হযরত (সাঃ) কি বলে কুরবানী করতেন ?

উ : তিনি বলতেন "বিস্‌মিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহুম্মা হাযা আন্নি ওয়া আস্মালাম ইয়াযাহ্‌ মিন উম্মাতি— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আমার আল্লাহ্‌ এই কুরবানী আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের ঐ সকল লোকের পক্ষ থেকে যাদের কুরবানী দেয়ার সামর্থ্য নেই, কবুল কর।

প্র : তকবীর কি এবং উহা কখন পাঠ করতে হয়।

উ : "আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ-কে তকবীর বলা হয় যা ৯ই যিলহজ্জের ফজরের ফরয নামাযের পর থেকে শুরু করে ১৩ই যিলহজ্জের আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের বাদে পাঠ করতে হয়। এর অর্থ হলো—আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ব্যতিরেকে কোন মাবূদ নেই এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রশংসা তাঁরই জন্যে। দুই ঈদের নামাযের শেষে এবং নামাযের স্থানে যাওয়া আসার পথেও আঁ-হযরত (সাঃ) এই তকবীর পাঠ করতেন।

প্র : কুরবানী কার উপর ধার্য হয় ?

উ : যে কুরবানী দেয়ার সামর্থ রাখে। এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা বা

(অবশিষ্টাংশ ৪৭ পৃঃ দেখুন)

একটি প্রতিবেদন

কানাডায় আহমদীয়া আন্দোলনের মুখপাত্র মাসিক 'নিউজ-লেটারের' এপ্রিল সংখ্যায় এম্‌নেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ও যুক্ত রাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বরাত দিয়ে, অত্যাচারের কাহিনী' শীর্ষক একটি বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। ইহাতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক সিনেট কমিটির কাছে ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ফেব্রুয়ারী মাসে প্রদত্ত বিশ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে। ১৯৯২ সনে পাকিস্তানে আহমদী সম্প্রদায়ের নারী-সদস্যদিগকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করার নূতন নূতন ঘটনা ঘটছে। পুলিশ আহমদীদের ধর্মোপাসনালয়, যাকে পাকিস্তানী আইনে মসজিদ বলা নিষিদ্ধ, বন্ধ করা অব্যাহত রেখেছে। কয়েকটি স্থানে আহমদীদের জামাতী নামাযে আক্রমণ করা হয়েছে। ১৯৯২ সনের প্রথম দিকে পুলিশ কোট্রি (সিন্ধু প্রদেশ) মসজিদে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার সময়, সম্মিলিত আহমদীগণের উপর পুলিশ চড়াও হয় ও আক্রমণ করে এবং সকল নামাযীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে কয়েকজনকে আটক করে রাখে এবং গালিগাজ ও মারপিট করে।

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, বস্তুতঃ ধর্মীয় আইন প্রণয়ন দ্বারা, সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ উৎসাহিত হচ্ছে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আহমদী সম্প্রদায় ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে চলেছে। ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরে পরেই, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টান ও হিন্দুদের বাড়ীঘর ও উপাসনালয় উশৃঙ্খল জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের ১৯৯২ সনের এই রিপোর্টে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু ধর্ম-গোষ্ঠীগুলির বিশেষ উদ্বেগ তুলে ধরেছে এবং বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান সরকার ব্যক্তির পরিচয়-পত্র ধর্মের নাম উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করার যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাচ্ছেন, তা নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য ও অসমতা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, পাকিস্তানী পাসপোর্টে ধর্মের উল্লেখ আগে থেকেই আছে। ইহা আহমদীদের হজ্জ-ব্রত পালনের পথে এক বিরাট অন্তরায়। ইসলাম পন্থীদের দাবী, পরিচয় পত্রের মধ্যেও ধর্মের উল্লেখ থাকুক।

এই রিপোর্ট হতে জানা যায়, ১৯৯২ সনে, অনেক আহমদীকে মোকদ্দমায় জড়ানো হয়েছে, শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। নিজের জায়গায় উপাসনালয় তৈরীর জন্যও তারা কারা ভোগ করেছেন। আহমদী বিরোধী বাদী পক্ষ নালিশ করেছে যে, অমুসলিমের দ্বারা উপাসনালয় তৈরীতে মুসলিমদের মনঃকষ্ট হয়েছে। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রণীত এই রিপোর্ট স্বীকার করেছে যে, ইহা সত্য যে, আহমদীগণের বিরুদ্ধে কষ্টদায়ক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। তাই সরকারের আওতাধীন কোন উন্নয়ন কর্মে আহমদীদের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া ও অংশ গ্রহণ অতিশয় সীমাবদ্ধ। এমনকি, আহমদী কিশোর-যুবকদের পক্ষে স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়াও কঠিন। এ ব্যাপারে তাদের ও অভিভাকদের

অভিযোগ রয়েছে। তারা অভিযোগ করেন কেবল; কষ্ট দিবার মানসে কিংবা অর্থ আদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। ধন-মান-সম্মান আক্রান্ত হলেও পুলিশ আহ্‌মদীদের সাহায্যে আসে না। এমনকি তাদের বক্তব্যও শুনতে চায় না। এই রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, প্রায় দুই হাজার মহিলা 'হুদুদ্-আইনের আওতায় জেলে বিচারাধীন অবস্থায় আছে।

১৯৯২ সনের জন্য 'এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল যে বিবরণী প্রণয়ন করেছে, তাতে বলেছে, "শান্তিপূর্ণভাবে স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাস পালন ও ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জুলাই মাসে সাম্‌ব্রিয়ালে আহমদীয়া উপাসনালয় আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। প্রার্থনাগারের (মসজিদের) দেয়ালে কলেমা লিখা থাকার অপরাধে ছয়জন আহমদী নামাযীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। অপরাধীরা বলেন, কলেমা তো ১৯৮৬ সনেও দেওয়ালে পেইন্ট করা ছিল। পুলিশ তার উপরে রং লাগিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় রং উঠে গেলে, কলেমা পুনরায় চোখে ভেসে উঠে। নূতন করে কেহ সেখানে কলেমা লিখেনি। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট পাকিস্তান পেনাল কোডের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে, কাহারো ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত হানার শাস্তি ২ বৎসর হতে ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে উন্নীত করেছে। এই অপরাধে প্রায়ই আহমদীদের বিচার করা হয়ে থাকে এবং শাস্তি দান করা হয়। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে নূতন ধরনের মোকদ্দমা দায়ের করা হচ্ছে। মাসিক পত্রিকা মিস্‌বাহ (মেয়েদের পত্রিকা) ও মাসিক পত্রিকা আনসারুল্লাহ্ (বয়োজ্যেষ্ঠদের পত্রিকা) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, এ দু'টি পত্রিকা ২৯৮ (গ) ধারা লঙ্ঘন করেছে। এম্নিভাবে 'দৈনিক আল ফযল' এর সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। 'দৈনিক আল ফযল' পাকিস্তানের আহমদীদের মুখপত্র। যুব কিশোরদের মুখপত্র খালেদ, ছোটদের পত্রিকা তাশ্‌হিযুল আয্‌হান—এ দু'টার বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আল ফযলের বিরুদ্ধে ৬১টি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে ৪২টি দাঁড় করানো হয়েছে পাঞ্জাব সরকারের হোম সেক্রেটারী (স্বরাষ্ট্র সচীব) কর্তৃক।

আহমদী শিক্ষক-শিক্ষিকার মৃত্যুদণ্ডের দাবী

লন্ধ্‌রান জিলার তুনিয়াপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন আহমদী শিক্ষক ও এক জন শিক্ষিকা (আমাতুল্লাহ্ সলীম)-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ২৯৫ (ক) ও ২৯৫ (গ) ধারায় অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এই বলে যে, তারা ইসলামের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পাঠ করার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর অবমাননা করেছে।

পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ গ্রহণ করেছে ও ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই ধারার আওতায় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করা যায়।

এমনিভাবে ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নিসার আহমদের বিরুদ্ধে ধর্ম প্রচারের অভিযোগে, আস্‌সালামু আলায়কুম বলার অভিযোগে ভেহারীর এডভোকেট চৌধুরী আহমদ বাজ্‌ওয়ার বিরুদ্ধে মুকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। অনুরূপ অভিযোগে রাওয়ালপিণ্ডির কুরাইশী মনোয়ার আহমদকে তিন বৎসরের জেল ও পনর হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। মুজাফ্‌ফর গড় জেলার নাসিরাবাদ হতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেছে যে, সেখানকার আহমদী মুসলিম অধ্যুষিত একটি গ্রামকে অন্য মুসলমানরা সম্পূর্ণ ঘেরাও করে রেখেছে ও অন্যান্য জনপদ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বাইরের সাথে ঐ গ্রামের যোগাযোগের সব উপায় ও পথ বন্ধ করে, তাদের প্রায় আটক অবস্থায় রেখেছে। এ জেলার হুসেনাবাদ গ্রামও একই অবস্থার শিকার হতে চলেছে। কোয়েটায়, বিমান-বন্দরে ১৯৮৫ সনে, তিনজন আহমদী মুবাল্লেগকে কলেমার ব্যাজ ধারণের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অদ্যাবধি তাদের বিচার সম্পন্ন হয় নি। ডেপুটি কমিশনার ইদানিং তাদের বিরুদ্ধে সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেবার সুপারিশ করেছেন বলে জানা গেছে।

ইদানিং পাকিস্তানের রাবওয়াতে, খত্‌মে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠানের মৌলবাদী গোষ্ঠি দু'দিন ব্যাপী এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং পীর-পুরোহিত মোল্লা-মৌলবীরা সেখানে গরম গরম বক্তৃতা প্রদান করেন। কট্টর নামকরা আহমদী বিরোধী মঞ্জুর চিনিউটীও সেখানে গালাগালিপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং দাবী জানান, আহমদীয়া সম্প্রদায়কে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, আহমদীদের কেন্দ্রভূমি রাবওয়ার নাম সরকারীভাবে পরিবর্তন করা হোক এবং সকল আহমদীকে ধর্মত্যাগী হিসাবে হত্যা করা হোক। আহমদীদের জন্য ডিশ্‌ এন্টিনা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক।

বৃটিশ বৈদেশিক ও কমনওয়েল্‌থ দফতর কর্তৃক পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ পেয়েছিল যে, গত ২৯শে অক্টোবর, ১৯৯২, প্রায় ১২০০ লোক ঢাকাস্থ আহমদীয়া মসজিদে আক্রমণ চালায় এবং সেখানে অবস্থানরত নামাযী ও অন্যান্য লোকদিগকে লোহার লাঠি-সটা, হাত-বোমা দ্বারা নির্দয়ভাবে প্রহার করে। আক্রমণকারীরা পিস্তল ও বন্দুক ব্যবহার করে। পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হয়। এর মধ্যে ২০ জনের জখম ছিল খুবই গুরুতর। উক্ত দফ্‌তর হতে এরূপ একটি সংবাদও প্রকাশ পায় যে, "ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ১৩ই নভেম্বর, ১৯৯২, বলেছেন, আহমদীগণকে অমুসলিম ঘোষণার কথা বিবেচনাধীন আছে।"

বাংলাদেশ হতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, আহমদীয়া মসজিদ আক্রমণের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে রাজশাহীতে ১৯৯২ সনের ২৭শে নভেম্বর। সেদিন ছিল শুক্রবার। প্রায় ১৫০০ লোক শোভাযাত্রা করে আহমদীয়া মসজিদে আসে এবং নব-নির্মিত মসজিদটি হামলা করে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা নির্মাণ-সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাব পত্র লুট-পাট করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। আইন-প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

অনুবাদ—মকবুল আহমদ খান, সম্পাদক

(৪৩ পৃঃ পর)

নেসাবের সীমারেখা নেই। যাকে আল্লাহ্‌তা'লা এই সুন্নত পালন করার তৌফীক দিয়েছেন তাকে এই সুন্নত অবশ্যই পালন করা উচিত।

প্র : কোন্ কোন্ পশু কুরবানী দেয়া যায়?

উ : গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, মহিষ প্রভৃতি হালাল জন্তু কুরবানী করা যায়। অবশ্যই কুরবানীর পশু স্বাস্থ্যবান, সতেজ, নিরোগ এবং নিখুঁত হতে হবে।

প্র : কুরবানীর চামড়া কি করতে হয়?

উ : কুরবানীর চামড়া বা উহার মূল্য স্থানীয় জামা'তের মাধ্যমে বায়তুল মালে জমা দিতে হয়।

প্র : কুরবানীর গোশ্‌ত বন্টনের নিয়ম কি?

উ : উহার নির্ধারিত কোন নিয়ম কানুন নেই তবে উহার মধ্যে আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব মিসকিনের হক্ (প্রাপ্য) রয়েছে। তাদেরকে দিয়ে নিজে খেতে হয়।

প্র : গরু, ছাগল ইত্যাদি কয়ভাগে কুরবানী দেয়া যায়?

উ : ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আর গরু, মহিষ, উট প্রভৃতি ৭ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়।

প্র : কুরবানীর পশুগুলো কি কি বয়সের হতে হবে?

উ : উট তিন বছরের, গরু দুই বছরের, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা প্রভৃতি কমপক্ষে এক বছরের হতে হবে। দুম্বা মোটা তাজা হলে ছয় মাস বয়সেও কুরবানী দেয়া যেতে পারে।

প্র : কখন কুরবানী করতে হবে?

উ : ১০ই যিলহজ্জ তারিখের ঈদের নামাযের পর থেকে আরম্ভ করে ১২ই যিলহজ্জ তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কুরবানী করা যায়।

সংবাদ

হুযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক বয়াতের তাহরীক

জাগ্রত হউন, জাগ্রত হউন, এবং আন্তর্জাতিক বয়াতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

এই আন্তর্জাতিক বয়াতের পরিকল্পনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর একটি কল্যাণজনক তাহরীক। ইহা একটি ঐশী প্রজ্ঞা; আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করতে যাচ্ছে।

হুযূর (আইঃ) বলেছেন, এবারের লণ্ডনস্থ সালানা জলসায় ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশে ন্যূনতম এক হাজার বয়াত হবে। আশা করা যাচ্ছে কোন কোন দেশে, যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, সে সকল দেশ হতে দশ দশ বিশ বিশ হাজার বয়াত পাওয়া যাবে, ইনশা আল্লাহ। এই বয়াত গ্রহণের অনুষ্ঠান নিম্নরূপে কার্যকর হবে:

কোন দেশে বয়াত গ্রহণকারীরা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশনের দৃশ্য দেখবেন এবং বয়াত অনুষ্ঠানে শামেল হবে। তাদের প্রতিনিধিগণ হুযুর (আইঃ) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে জলসায় অংশ গ্রহণ করবেন এবং তাঁর (আইঃ) হাতে বয়াত করবেন। ইহা এক অসাধারণ ও খোদার দৃষ্টিতে সুন্দর বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। ইহা হবে বিশ্বজনীন অনুষ্ঠান। এই বয়াত অনুষ্ঠানে আকাশের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে নেবে। এজন্যেও ইহা অবশ্যই খোদার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যও হবে।

অতএব আশীষপ্রাপ্ত হবে সে সকল সৌভাগ্যবান জামা'ত যেখান থেকে এত বয়াত গ্রহণকারী হবে যে, তাদেরকে লণ্ডন সালানা জলসায় প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দেয়া হবে। সৌভাগ্যবান হবেন সে সকল পুণ্যবান ব্যক্তি যাদেরকে বয়াত গ্রহণের জন্য জলসায় নিমন্ত্রণ করা হবে। তারা খোদার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের হাত খোদার পবিত্র মসীহ্ (আঃ)-এর খলীফার হাতে রেখে ইসলামের বিজয়ের জন্যও ইমাম মাহদীর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর সৌভাগ্যবান হবেন সে সকল ব্যক্তি যারা এরূপ অসাধারণ প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াতে অংশগ্রহণ করে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহায্যকারী হয়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হবেন।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা, দোয়া ও সংকল্পের সাথে নিজেদের গতিকে দ্রুততর করুন। নিজেদের প্রচেষ্টাকে চোখের পানি দ্বারা আরো বেগবান করুন। বয়াতের সংখ্যাকে এত বাড়িয়ে দিন যেন এই বরকতময় অনুষ্ঠানে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

আজই উঠুন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে সফলতার জন্য জামা'তের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে সফলতা দান করুন। আপনাদের দেশ হতে কমপক্ষে এক-হাজার বয়াতের আশা করা হচ্ছে। আমাদের প্রিয় নেতা খোদার পবিত্র মসীহ্‌র খলীফার এই আশার জ্যোতিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলুন। কখনো এ জ্যোতিকে নিভতে দেবেন না

ওয়াস্‌সালাম

হাদী আলী

এডিশনাল ওকীলুত তবশীর

লণ্ডন মসজিদ, লণ্ডন

কাদিয়ানের জলসা সালানা—১৯৯৩

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এ বছর কাদিয়ানের জলসা সালানার জন্যে নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৬-২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে অনুমোদন দান করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে সকল দিক থেকে জামা'তের জন্যে বরকতপূর্ণ করুন। বন্ধুগণ এ মহান আধ্যাত্মিক জলসায় যোগদানের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন।

আল্লাহ্‌তা'লা পূর্বের চাইতে অধিক সংখ্যায় বন্ধুগণকে কাদিয়ানের সালানা জলসা ১৯৯৩-তে যোগদান করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন

নায়েব দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান

(সাপ্তাহিক বদরের ২৯-৪-৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছাবাণী

আসছে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে সকল আহমদী ভাই ও বোনকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এক-অদ্বিতীয় পুত্রকে যবাই করতে উদ্যত হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের নিকট যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সেই আত্মসমর্পণের প্রেরণা যদি আমরা প্রতিটি হৃদয়ে পুনর্বাসিত করতে সক্ষম হই তা হলেই পশু কুরবানীর মাধ্যমে আমরা যে আবেগ ও প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকি তার যথার্থ মূল্যায়ণ হবে। আমরা যুগ-ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরোক্ত কুরবানীর প্রেরণা ও আবেগ আমাদেরকে কতখানি নাড়া দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখার উপযুক্ত সময় এখনই। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে ইব্‌রাহীমি কুরবানীর জ্যোতিতে যথার্থ দীপ্তিমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ ঃ

বিগত ২৩শে এপ্রিল ১৯৯৩ইং রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের ৩য় সালানা জলসা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে আল্লাহ্‌র রহমতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সালানা জলসায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। জলসা অনুষ্ঠান দু'টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম হেলাল উদ্দিন আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় আমীর। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব খন্দকার হাবিবুল ইসলাম (রঞ্জু)। প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌলানা ফারুক আহমদ, সদর মুরব্বী, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, ভিজির আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম।

মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাযের বিরতির পর নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতরম ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, মীর মোবাশ্বের আলী, মৌলানা আবদুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী, সদর মুরব্বী, প্রধান অতিথি ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব চৌধুরী আতিকুল ইসলাম, সেক্রেটারী। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সালানা জলসার পরিসমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় বেশ কিছু সংখ্যক গয়ের আহমদী সুধী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় পাঁচ-শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

রফিউদ্দিন আহমদ
জেঃ সেঃ, আঃ মুঃ জাঃ নাঃ গঞ্জ

তারুয়া জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার ৫৫তম সালানা জলসা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে গত ৭ ও ৮ই মে '৯৩ রোজ শুক্র ও শনিবার "মসজিদে 'বাশারত" তারুয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

তিনটি অধিবেশন সম্বলিত মহতী জলসায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া, জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিয়া) আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ও জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

তেলাওয়াতে কুরআন পাক ও নযম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুসলেহ উদ্দিন আহমদ। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব ইসমাইল দেওয়ান (মোয়াল্লেম), ডাঃ আহমদ আলী সাহেব (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তারুয়া),

মোহাম্মদ আবদুল হাদী, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, হাফেয সেকান্দর আলী, মৌলানা সালেহ আহমদ, জহির আহমদ, এ, কে, রেজাউল করিম, সেক্রেটারী ওসীয়্যত, খন্দকার সাঈদ আহমদ, আমীর, বি, বাড়িয়া ও এস, এম হাবিবুল্লাহ্‌।

জলসাতে হুযুর আকদাস (আঃ) কর্তৃক ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে একখানা ডিস এন্টিনা প্রদান করা হয়। পরিশেষে ন্যাশন্যাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়।

জহির আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া

নিউ সোনাতলা জামাত ঃ

গত ১৩ই এপ্রিল '৯৩ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিউ সোনাতলায় ৩য় সালানা জলসা অত্যন্ত শান-শওকত ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)

প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আক্কেল আলী। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী, খন্দকার আজমল হক সাহেব, মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব, সদর মুরব্বী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রজীব উদ্দিন সাহেব। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব খন্দকার আজমল হক সাহেব, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী, মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব সদর মুরব্বী। অধ্যাপক রজীব উদ্দীন সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, জনাব আক্কেল আলী, প্রেসিডেন্ট নিউ সোনাতলা। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে।

এস, এম, আবদুল হক
মোয়াল্লেম, আঃ মুঃ জঃ নিউ সোনাতলা

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা দাতাদের জ্ঞাতব্য

(১) আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গের পাঠক বৃন্দ! আপনারা কলিকাতার আমীর সাহেবের কাছে আহমদী পত্রিকার চাঁদা বাবৎ কমপক্ষে একশত রুপী করে জমা দিন। টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিবেন এবং আমাদেরকে জানাবেন।

(২) আহমদী পত্রিকার বাংলাদেশী গ্রাহকবৃন্দ! আপনারা দয়া করে সত্বর আপনাদের চাঁদা (যদি পরিশোধ না করে থাকেন) প্রেরণ করুন। আহমদী পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশে এবং উন্নতিতে সহায়তা করুন।

—নির্বাহী সম্পাদক

প্রশংশনীয় পদক্ষেপ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগর-এর স্থানীয় কায়েদ সাহেবের উদ্যোগে মেধাবী ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সপ্তাহে তিন দিন ব্যাপী গত ১/৫/৯৩ তারিখ হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ চালু করা হয়েছে। উক্ত ক্লাশে নিয়মিতভাবে ১৫/১৬ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে আসছে। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাশের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সদর মুরব্বী জনাব বশিরুর রহমান সাহেব এবং অত্র জামাতের বিভিন্ন সদস্য। উল্লেখিত ক্লাশ যেন বরকতময় হয়, আপনাদের সকলের নিকট বিনীতভাবে এ আবেদন করছি।

আবদুল মাওলা
জেলা কায়েদ, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

আমাদের একমাত্র ছেলে ইউনিক আহমদ রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ১৯৯২ সনের বৃত্তি পরীক্ষায় বিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মেধা তালিকায় বৃত্তি পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার দুনিয়াবী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আঞ্জুমান আরা ওয়াজেদ
আঃ মুঃ জাঃ হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর

রক্তদান কর্মসূচী

গত ৩০শে এপ্রিল '৯৩ ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার খেদমতে খাল্‌ক বিভাগের উদ্যোগে একটি রক্তদান কর্মসূচী সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। উক্ত প্রোগ্রামে ৩২ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, একজন সুস্থ মানুষ প্রতি চার মাস অন্তর এক ব্যাগ রক্ত দিতে পারেন। তাই খোদ্দাম ও আনসার ভাইগণকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য এবং আর্ত মানবতার সেবায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান, নায়েম
খেদমতে খাল্‌ক,
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা,

শুভ বিবাহ

ইতিপূর্বে প্রকাশিত (২০তম সংখ্যায়) বিবাহের এলানে নাম ও তারিখে কিছু ভুল হয়েছিল, তাই সংশোধন ও দোয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় লিখছি যে, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হালীমা সাদেকা (লাকী)-এর শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব সৈয়্যদ ইব্‌রাহীম সোলায়মান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়্যদ হাসান মাহমুদের সহিত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হক্ মহরানায় ১২ই ফেব্রুয়ারী '৯৩ তারিখে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান রাবওয়া হতে আগত সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মাওলানা মুযাফফর আহমদ সাহেব। সকল ভাই বোনের নিকট আমি দোয়ার আকুল আবেদন করছি যেন পরম দয়াল খোদা এই বিবাহকে সর্বাঙ্গীনভাবে সুখী সুন্দর ও বরকতপূর্ণ করেন।

মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী

দোয়ার এলান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আমার আম্মা মিসেস মোমেনা খাতুন খুবই অসুস্থ। তার সম্পূর্ণ রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মিসেস আঞ্জুমান আরা হাদী, ঢাকা

বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আবদুস সালামের আহমদীয়া মুসলিম জমাতের দারুত তবলীগে শুভাগমন

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আবদুস সালাম ২২শে মে, ১৯৯৩ বিকাল ৭ টায় বকসি বাজারস্থ আহমদী মুসলিম জমাতের কমপ্লেক্সে আগমন করেন। মুহতরম ন্যশন্যাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত শতশত আহমদী তাঁকে প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে বরণ করে নেয়। দেশের বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও এই সময় আঞ্জুমানে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হয়। অতঃপর অধ্যাপক আবদুস সালাম পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে তার মূল্যবান ভাষণ শুরু করেন। তিনি বসনীয়া সহ পৃথিবীর নানা দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপ্তির ব্যাপারেও তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে বিজ্ঞান চর্চায় রত হতে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর সমগ্র বক্তব্যটি ছিল সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুর উপর।

অধ্যাপক আবদুস সালামের বক্তৃতার বাংলা সার সংক্ষেপ পেশ করেন নায়েব ন্যাশন্যাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। উল্লেখ্য যে সভায় মানপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। ঘোষণায় ছিলেন অধ্যাপক মোজাহেদ উদ্দীন। জনাব আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে এই সুন্দর সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। আহমদী বার্তা

শোক সংবাদ

উত্তর আহমদী পাড়া নিবাসী আবদুল হাশিম (বয়স ৬০ বৎসর) ১০/৫/৯৩ইং তারিখে বিকাল ৪-০০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি কয়েক মাস যাবৎ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে ২ ছেলে ২ মেয়ে ও নাতি-নাতনী রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিয়া),
আমীর, আঃ মুঃ জাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ডাক্তার সাহেব আর এ দুনিয়াতে নেই!

আমরা অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাক্তন নায়েবে আমীর ও মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের যয়ীম-এ-আলা **ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী** গত ২২শে মে দিন গত রাত্র ১-৩০ মিঃ এর সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মরহুম ঐ দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭১ বছর। তিনি তাঁর

অবশিষ্টাংশ ৫৫ পাতায় দেখুন

মসীহে মাওউদের (আঃ) একটি ভবিষ্যদ্বাণী

মসীহে মাওউদ (আঃ) বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা তাঁর জীবদ্দশায় এবং তিরোধানের পর ক্রমাগতভাবে পূর্ণ হয়ে চলেছে। অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনাগত ভবিষ্যতে যথা সময়ে পূর্ণ হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মসীহে মাওউদ (আঃ) তাঁর এক ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেছিলেন যে,—হামে ইস্‌সে ইনকার নেহিঁ কে হামারে বাদ কুই আওর ভি মসীহ কা মসীল বন কর আওয়ে, কিউকে নবীউকি মসীল হামেশা দুনিয়া মে হোতে রহতে হ্যায়। বলকে খোদায়েতা'লা নে এক কত্‌য়ী আওর একিনী পেশগুয়ী মে মেরে পর জাহের কর রাখ্‌খা হ্যায় কে মেরি হি জুর্‌রিয়াত সে এক শখ্‌স পয়দা হোগা জিস্‌কে কই বাতোঁমে মসীহ সে মশাবহাত হোগী ওহ্‌ আসমান সে উতরেগা আওর জমীন ওয়ালোঁ কি রাহ সিধে করদেগা ও আসিরোঁকো রুস্‌তগারী বখ্‌শেগা আওর উনকো জো শুভহাতকে জিঞ্জিরো মে মোকয়েদ হ্যায় রেহাই দেগা (ইযালায়ে আওহাম : ১ম খণ্ড, ১৭৯ ও ১৮০ পৃঃ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : (এক) নবীদের মসীল সর্বদাই জগতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। অতএব, মসীহে মাওউদের (আঃ) পরও অন্য মসীহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে : (দুই) মসীহে মাওউদের (আঃ) অধঃস্তন পুরুষদের মধ্যেও একজন মসীহ সদৃশ্য ব্যক্তি হবেন : (তিন) এই মসীলে মসীহকে মানুষ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে। ইনি জগদ্বাসীকে সোজা পথ দেখাবেন, বন্দীদেরকে মুক্ত করবেন এবং মানবজাতি যে সব সন্দেহে আবদ্ধ আছে তা থেকে মুক্ত করবেন।

হাদীসে ছিল—ইয়াখরুজু কায়িমুনা আহলাল বায়তে ইয়াওমাল জুময়াতে (বিহারুল আনওয়ার)। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে সেই যুগের ইমামকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঘরে ঘরে শুক্রবার দিন নাযিল হতে দেখা যাবে।

আজ আমরা প্রতি শুক্রবারে খলীফাতুল মসীহকে (আইঃ) ঘরে ঘরে নাযিল হতে দেখছি। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা একমাত্র খলীফাতুল মসীহই (আইঃ) দিতে পারেন। এখানে এও উল্লেখ্য যে এক বা একাদিক পারশ্য বংশীয় ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানকে সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে পুনরায় পৃথিবীতে সংস্থাপন করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(ঋতু পত্রের সৌজন্যে)

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ১/৪/৯৩ তাং ভোর ৫-৪০ মিনিটের সময় আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌) নব জাতিকার মা ও সে কুশলে আছে। নব জাতিকা ও তার মায়ের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। মোঃ আকবর হোসেন, খুলনা জামাত

গত ১২ই মে, ১৯৯৩ ইং আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌) সে ওয়াক্‌ফে নও এর অন্তর্ভুক্ত। তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সফলতার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়া প্রার্থী।

দোয়ার জন্যে পাক্ষিক আহমদীর খাতে থাকসার ১০০/— টাকা জমা দিয়েছি।

এহসানউল আলম, তেজগাঁও, ঢাকা

সম্পাদকীয়

কুরবানী অর্থ উপাসনা

কুরব অর্থ নিকট, নৈকট্য। কুরব থেকে কুরবানী। এর অর্থ যদ্বারা নৈকট্য লাভ করা যায়। উপাসনা অর্থ—উপসমীপে বাস। অর্থাৎ—নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভ করাই মানবের জীবনের সার্থকতা। অনেকেই মিনাল মুকার্‌রবীন হয়েছেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) মহানবী (সাঃ)-এর পর অন্য সব নবী থেকে স্রষ্টার বেশী নৈকট্য প্রাপ্ত নবী। ইনি আধ্যাত্মিকতার সপ্তম স্তর (সাত আকাশ) পর্যন্ত উন্নীত হয়েছেন। অপর দিকে ঈসা (আঃ) উন্নীত হয়েছেন দ্বিতীয় স্তর (দ্বিতীয় আকাশ) পর্যন্ত। পবিত্র কুরআন শরীফে তিনটি সূরায় কমপক্ষে চল্লিশবার ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে উৎকৃষ্ট আদর্শের অধিকারী বলেছেন (মুমতাহানাহঃ ৫)। তাঁকে মানব জাতির ইমাম করা হয়েছিল (২ঃ ১২৫)। সমগ্র মুসলিম সমাজকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম বলা হয়েছে।

ইব্‌রাহীমে (আঃ)-এর এহেন উন্নতির কারণ তিনি সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি—জীবন মরণ সবকিছু তিনি কুরবান করেছিলেন আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেন। এটি ছিল যিবহিন আযীম বা মহা কুরবানী (বলিদান)। সূরা সাফ্‌ফাতে এই কুরবানীর কথা বর্ণিত হয়েছে। ওয়া তারাকনা আলায়হে ফিল আখেরীন—অর্থাৎ পরবর্তীদের জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) ত্যাগকে আদর্শরূপে স্থাপন করা হয়েছে (সাফ্‌ফাতঃ ১০৯) প্রতি বৎসর আমরা হজ্জ এবং ঈদুল আযহার দিনে এই মহৎ আদর্শকে স্মরণ করি।

ঈদুল আযহা পুত্র কুরবানীর দিন। সম্প্রতি 'ওয়াকফে নও' দ্বারা এই সুন্নতকে পুনরায় জাগ্রত করা হয়েছে। আখারীনদের জামাত আহমদী জমাত তাদের ইমামের আহবানে নিজেদের সন্তানকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করে চলেছেন। এই পুত্র কুরবানীর মধ্যেই ঈদুল আযহার স্বার্থকতা নিহিত।

—নির্বাহী সম্পাদক

---

৫৩ পৃঃষ্টার পর

স্ত্রী, ৪ পুত্র, ১ কন্যা, কয়েকজন নাতি-নাতনী ও বহু আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে মারা যান। নাটোরের এক বিশিষ্ট খান চৌধুরী পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পুণ্যবান, সদা-হাস্যোজ্জ্বল, অতিবিনয়ী, ধৈর্যশীল ও নিরহংকার, ভদ্র, ফেরেশ্‌তা সদৃশ এ মানুষটি বিভিন্নপদে থেকে জামাতের বহু খেদমত করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন হাজী ও মুসী। জামাতের আর্থিক কুরবানীতে তাঁর একটি বিশেষ অংশ ছিল। তিনি কাযা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি আহমদীয়া আর্ট প্রেস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের একজন প্রখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। অত্র এলাকায় বহু রুগী তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় রোগ মুক্তি লাভ করেছে।

আমরা মরহুমের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। মরহুমের রূহকে আল্লাহ্‌তা'লা মাগফেরাত দান করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমরা তাঁর দারাযাতের বুলন্দী কামনা করি এবং তাঁর পরিবারের সকলকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে সাব্‌রে জামীল দান করুন।

তাঁর মৃত্যুতে জামাতের যে, অপুরণীয় ক্ষতি হলো তা কেবল পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লাই পূর্ণ করে দিতে পারেন। ২৩-৫-৯৩ তারিখ সকাল ১০টায় দারুত তবলীগে মরহুমের জানাযা নামাযের পর তাঁর মরদেহ দাফনের জন্য নাটোরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আহমদী বার্তা

আহ্‌মদী

31st May1993

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এহ কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury